

নব্বী-কাঁথার মাঠ

পল্লীকবি জসীমুদ্দিন

এক

বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি মধ্যে ক্ষীর নদী,
উইড়া যাওয়ার সাধ ছিল, পাঞ্জা দেয় নাই বিধি।

—রাখালী গান

এই এক গাঁও, ওই এক গাঁও—মধ্যে ধু ধু মাঠ,
ধান কাউনের লিখন লিখি করছে নিতুই পাঠ।
এ-গাঁও যেন ফাঁকা ফাঁকা, হেথায় হোথায় গাছ;
গেঁয়ো চাষীর ঘরগুলি সব দাঁড়ায় তারি পাছ।
ও-গাঁয় যেন জমাট বেঁধে বনের কাজল-কায়া,
ঘরগুলিরে জড়িয়ে ধরে বাড়ায় ঘরের মায়া।

এ-গাঁও যেন ও-গাঁর দিকে, ও-গাঁও এ-গাঁর পানে,
কতদিন যে কাটবে এমন, কেইবা তাহা জানে!

মাঝখানেতে জলীর বিলে জ্বলে কাজল-জল,
বক্ষে তাহার জল-কুমুদী মেলছে শতদল।

এ-গাঁর ও-গাঁর দুধার হতে পথ দুখানি এসে,
জলীর বিলের জলে তারা পদ্ম ভাসায় হেসে!

কেউবা বলে—আদ্যিকালের এই গাঁর এক চাষী,
ওই গাঁর এক মেয়ের প্রেমে গলায় পরে ফাঁসি;
এ-পথ দিয়ে একলা মনে চলছিল ওই গাঁয়ে,
ও-গাঁর মেয়ে আসছিল সে নূপুর-পরা পায়ে!

এই খানেতে এসে তারা পথ হারায়ে হায়,
জলীর বিলে ঘুমিয়ে আছে জল-কুমুদীর গায়।
কেইবা জানে হয়ত তাদের মাল্য হতেই খসি,
শাপলা-লতা মেলছে পরাগ জলের উপর বসি।

মাঠের মাঝে জলীর বিলের জোলো রঙের টিপ,
জ্বলছে যেন এ-গাঁর ও-গাঁর বিরহেরি দীপ!

বুকে তাহার এ-গাঁর ও-গাঁর হরেক রঙের পাখি,
মিলায় সেথা নূতন জগৎ নানান সুরে ডাকি।
সন্ধ্যা হলে এ-গাঁর পাখি এ-গাঁও পানে ধায়,

ও-গাঁর পাখি এ-গাঁয় আসে বনের কাজল ছায়।
এ-গাঁর লোকে নাইতে আসে, ও-গাঁর লোকও আসে
জলীর বিলের জলে তারা জলের খেলায় ভাসে।

এ-গাঁও ও-গাঁও মধ্যে ত দূর-শুধুই জলের ডাক,
তবু যেন এ-গাঁয় ও-গাঁয় নাইক কোন ফাঁক।
ও-গাঁর বধু ঘট ভরিতে যে ঢেউ জলে জাগে,
কখন কখন দোলা তাহার এ-গাঁয় এসে লাগে।
এ-গাঁর চাষী নিঘুম রাতে বাঁশের বাঁশীর সুরে,
ওইনা গাঁয়ের মেয়ের সাথে গহন ব্যথায় বুঝে!
এগাঁও হতে ভাটীর সুরে কাঁদে যখন গান,
ও-গাঁর মেয়ে বেড়ার ফাঁকে বাড়ায় তখন কান।
এ-গাঁও ও-গাঁও মেশামেশি কেবল সুরে সুরে;
অনেক কাজে এরা ওরা অনেকখানি দূরে।

এ-গাঁর লোকে দল বাঁধিয়া ও-গাঁর লোকের সনে,
কাইজা^১ ফ্যাসাদ^২ করেছে যা জানেই জনে জনে।
এ-গাঁর লোকও করতে পরখ্ ও গাঁর লোকের বল,
অনেক বারই লাল করেছে জলীর বিলের জল।
তবুও ভাল, এ-গাঁও, ও-গাঁও, আর যে সবুজ মাঠ,
মাঝখানে তার ধুলায় দোলে দুখান দীঘল বাট;
দুই পাশে তার ধান-কাউনের অথই রঙের মেলা,
এ-গাঁর হাওয়ায় দোলে দেখি ও-গাঁয় যাওয়ার ভেলা।

১) কাইজা= মারামারি। ২) ফ্যাসাদ= ঝগড়া।

দুই

এক কালা দাতের কালি যা দ্যা কলম লেখি,
আর এক কালা চক্ষের মণি, যা দ্যা দৈনা দেখি,
-ও কালা, ঘরে রইতে দিলি না আমারে।

-মুর্শিদা গান।

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কিসের রঙিন ফুল!
কাঁচা ধানের পাতার মত কচি-মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দুখান সরু,
গা খানি তার শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কেগো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজলী মেয়ে পিছলে পড়ে ছড়িয়ে আলোর খেল।
কচি ধানের তুলতে চারা হয়ত কোনো চাষী,
মুখে তাহার জড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি।
কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দাতের কালি দিয়েই কেতাব কোরাণ লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব করছে জয়।
সোনায় যে-জন সোনা বানায়, কিসের গরব তার'
রঙ পেলে ভাই গড়তে পারি রামধণুকের হার।
কালোয় যে-জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
তারির পদ-রজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,
কালো-বরণ চাষীর ছেলে জুড়ায় যেন বুক।
যে কালো তার মাঠেরি ধান, যে কালো তার গাঁও!
সেই কালোতে সিনান্ করি উজল তাহার গাও।
আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।

জারীর গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
“শাল-সুন্দী-বেত” যেন ও, সকল কাজেই লাগে।
বুড়োরা কয়, ছেলে নয় ও, পাগাল^১ লোহা যেন,
রূপাই যেমন বাপের বেটা কেউ দেখেছ হেন?
যদিও রূপা নয়কো রূপাই, রূপার চেয়ে দামী,
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামী।

১) পাগাল= ইম্পাত (সম্ভবতঃ কথাটি ‘পাঁজানো’ (পান দেওয়া)র পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ)।

BANGLADARSHAN.COM

তিন

চন্দনের বিন্দু বিন্দু কাজলের ফোঁটা

কালিয়া মেঘের আড়ে বিজলীর ছটা

—মুর্শিদা গান

ওই গাঁখানি কালো কালো, তারি হেলান দিয়ে,
ঘরখানি যে দাঁড়িয়ে হাসে ছোনের ছানি নিয়ে;
সেইখানি এক চাষীর মেয়ে নামটি তাহার সোনা,
সাজু^১ বলেই ডাকে সবে, নাম নিতে যে গোনা^২।
লাল মোরগের পাখার মত ওড়ে তাহার শাড়ী,
ভোরের হাওয়া যায় যেন গো প্রভাতী মেঘ নাড়ি।
মুখখানি তার চলচল চলেই যেত পড়ে,
রাঙা ঠোঁটের লাল বাঁধনে না রাখলে তায় ধরে।
ফুল ঝর-ঝর জন্তি গাছে জড়িয়ে কেবা শাড়ী,
আদর করে রেখেছে আজ চাষীদের ওই বাড়ী।
যে ফুল ফোটে সোনার খেতে, ফোটে কদম গাছে,
সকল ফুলের ঝলমল গা-ভরি তার নাচে।

কচি কচি হাত পা সাজুর, সোনায় সোনার খেলা,
তুলসী-তলায় প্রদীপ যেন জ্বলছে সাঁঝের বেলা।
গাঁদাফুলের রঙ দেখেছি, আর যে চাঁপার কলি,
চাষী মেয়ের রূপ দেখে আজ তাই কেমনে বলি?
রামধনুকে না দেখিলে কি-ই বা ছিল ক্ষোভ,
পাটের বনের বউ-টুবাণীও, নাইক দেখার লোভ।
দেখেছি এই চাষীর মেয়ের সহজ গৈয়ো রূপ,
তুলসী-ফুলের মঞ্জরী কি দেব-দেউলের ধূপ!
দু-একখানা গয়না গায়ে, সোনার দেবালয়ে,
জ্বলছে সোনার পঞ্চ প্রদীপ কার বা পূজা বয়ে!
পড়শীরা কয়-মেয়ে ত নয়, হল্‌দে পাখির ছা,
ডানা পেলেই পালিয়ে যেত ছেড়ে তাদের গাঁ।

এমন মেয়ে-বাবা ত' নেই, কেবল আছেন মা;
গাঁওবাসীরা তাই বলে তায় কম জানিত না।
তাহার মতন চেকন 'সেওই' কে কাটিতে পারে,
নক্সী করা 'পাকান পিঠায়' সবাই তারে হারে।
হাঁড়ির উপর চিত্র করা শিকেয় তোলা ফুল,
এই গাঁয়েতে তাহার মত নাইক সমতুল।
বিয়ের গানে ওরই সুরে সবারই সুর কাঁদে,
“সাজু গাঁয়ের লক্ষ্মী মেয়ে”-বলে কি লোক সাধে?

১) সাজু= পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো জেলায় বাপের বাড়িতে মুসলমান মেয়েদের নাম ধরিয়া ডাকা হয় না। বড় মেয়েকে বড়, মেঝ মেয়েকে মাজু, সেজ মেয়েকে সাজু এইভাবে ডাকে। শ্বশুরবাড়ির লোকে কিন্তু এ নামে ডাকিতে পারে না।

২) গোনা= পাপ

৩) বউ টুবাণী= মাঠের ফুল

BANGLADARSHAN.COM

চার

কানা দেয়ারে, তুই না আমার ভাই,
আরও ফুটিক ডলক^১ দে, চিনার ভাত খাই।

—মেঘরাজার গান

চৈত্র গেল ভীষণ খরায়^২, বোশেখ রোদে ফাটে,
এক ফোঁটা জল মেঘ চোঁয়ায়ে নামল না গাঁর বাটে।
ডোলের বেছন^৩ ডোলে চাষীর, বয় না গরু হালে,
লাঙল জোয়াল ধুলায় লুটায় মরচা ধরে ফালে।
কাঠ-ফাটা রোদ মাঠ বাটা বাট আগুন লয়ে খেলে,
বাউকুড়াগী^৪ উড়ছে তারি ঘূর্ণী ধূলি মেলে।
মাঠখানি আজ শুনো খাঁ খাঁ, পথ যেতে দম আঁটে,
জন্-মানবের নাইক সাড়া কোথাও মাঠের বাটে;
শুকনো চেলা কাঠের মত শুকনো মাঠের চেলা,
আগুন পেলেই জ্বলবে সেথায় জাহান্নামের^৫ খেলা।
দরুগা তলা দুক্ষে ভাসে, সিন্ধী আসে ভারে;
নৈলা গানের^৬ বাক্বারে গাঁও কানছে বারে বারে।
তবুও গাঁয়ে নামল না জল, গগনখানা ফাঁকা;
নিঠুর নীলের পক্ষে আগুন করছে যেন খাঁ খাঁ।
উচ্ছে ডাকে বাজপক্ষি ‘আজরাইলে’র ডাক,
‘খর-দরজাল’^৭ আসছে বুঝি শিঙায় দিয়ে হাঁক!

এমন সময় ওই গাঁ হতে বদনা-বিয়ের গানে,
গুটি কয়েক আসল মেয়ে এই না গাঁয়ের পানে।
আগে পিছে পাঁচটি মেয়ে পাঁচটি রঙে ফুল,
মাবের মেয়ে সোনার বরণ, নাই কোথা তার তুল।
মাথায় তাহার কুলোর উপর বদনা-ভরা জল,
তেল-হলুদে কানায় কানায় করছে ছলাৎ ছল।
মেয়ের দলে বেড়িয়ে তারে চিকন সুরের গানে,
গাঁয়ের পথে যায় যে বলে বদনা-বিয়ের মানে।
ছেলের দলে পড়ল সাড়া, বউরা মিঠে হাসে,
বদনা-বিয়ের গান শুনিতে সবাই ছুটে আসে।

পাঁচটি মেয়ের মাঝের মেয়ে লাজে যে যায় মরি,
বদনা হতে ছলাৎ ছলাৎ জল যেতে চায় পড়ি।
এ-বাড়ি যায় ও-বাড়ি যায়, গানে মুখর গাঁ,
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে যেন রাম-শালিকের ছা।

কালো মেঘা নামো নামো, ফুল-তোলা মেঘ নামো,
ধূলট মেঘা, তুলট মেঘা, তোমরা সবে ঘামো!
কানা মেঘা, টলমল বারো মেঘার ভাই,
আরও ফুটিল ডলক দিলে চিনার ভাত খাই!
কাজল মেঘা নামো নামো চোখের কাজল দিয়া,
তোমার ভালে টিপ আঁকিব মোদের হলে বিয়া!
আড়িয়া মেঘা, হাড়িয়া মেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাতি,
নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি।
কৌটা ভরা সিঁদুর দিব, সিঁদুর মেঘের গায়,
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়!

দেয়ারে তুমি অধরে অধরে নামো।

দেয়ারে তুমি নিষালে নিষালে নামো।

ঘরের লাঙল ঘরে রইল, হাইলা চাষা রইদি মইল;
দেয়ারে তুমি অরিশাল বদনে চলিয়া পড়।
ঘরের গরু ঘরে রইল, ডোলের বেছন ডোলে রইল;
দেয়ারে তুমি অধরে নামো।’

বারো মেঘের নামে নামে এমনি ডাকি ডাকি,
বাড়ি বাড়ি চল্ণ তারা মাঙন হাঁকি হাঁকি।
কেউবা দিল এক পোয়া চাল, কেউবা ছটাকখানি,
কেউ দিল নুন, কেউ দিল ডাল, কেউবা দিল আনি।
এমনি ভাবে সবার ঘরে মাঙন করি সারা,
রূপাই মিঞার রুশাই-ঘরের^৮ সামনে এল তারা।
রূপাই ছিল ঘর বাঁধিতে, পিছন ফিরে চায়,
পাঁচটি মেয়ের রূপ বুঝি ওই একটি মেয়ের গায়!
পাঁচটি মেয়ে, গান যে গায়, গানের মতই লাগে,
একটি মেয়ের সুর ত নয় ও বাঁশী বাজায় আগে।

ওই মেয়েটির গঠন-গাঠন চলন-চালন ভালো,
পাঁচটি মেয়ের রূপ হয়েছে ওরির রূপে আলো।

রূপাইর মা দিলেন এনে সেরেক খানেক ধান,
রূপাই বলে, “এই দিলে মা থাকবে না আর মান।”
ঘর হতে সে এনে দিল সেরেক পাঁচেক চাল,
সেরেক খানেক দিল মেপে সোনা মুগের ডাল।
মাঙন সেরে মেয়ের দল চল্ল এখন বাড়ি,
মাবের মেয়ের মাথার বোঝা লাগছে যেন ভারি।
বোঝার ভারে চলতে নারে, পিছন ফিরে চায়;
রূপার দুচোখ বিঁধিল গিয়ে সোনার চোখে হয়।

- ১) ডলক= বৃষ্টি।
- ২) খরায়= গরমে।
- ৩) বেছন= বীজ।
- ৪) বাউকুড়াগী= ঘূর্ণিবায়ু।
- ৫) জাহান্নাম= নরক।
- ৬) নৈলা গান= বৃষ্টি নামাইবার জন্য চাষীরা এই গান গাহিয়া থাকে।
- ৭) খর-দরজাল= পলয়ের দিনে ইনি বেহেস্ত ও দোষক মাথায় করিয়া আসিবেন [খাড়া দর্জাল]
- ৮) রুশাই-ঘরের= রক্ষন শালার।

BANGLADARSHAN.COM

পাঁচ

লাজ রক্ত হইল কন্যার পরথম যৈবন

—ময়মনসিংহ গীতিকা

আশ্বিনেতে ঝড় হাঁকিল, বাও ডাকিল জোরে,
গ্রামভরা-ভর ছুটল ঝাপট লটপটা সব করে।
রূপ বাড়ির রুশাই-ঘরের ছুটল চালের ছানি,
গোয়াল ঘরের খাম^১ খুয়ে তার চাল যে নিল টানি।

ওগাঁর বাঁশ দশটা টাকায়, সে গাঁয় টাকায় তেরো,
মধ্যে আছে জলীর বিল কিইবা তাহে গেরো^২।
বাঁশ কাটিতে চল্ল রূপাই কোঁচায় বেঁধে চিঁড়া,
দুপুর বেলায় খায় যেন সে-মায় দিয়াছে কিরা।
মাজায় গৌজা রাম-কাটারী চক্চকাচক্ ধার,
কাঁধে রঙিন গামছাখানি দুলছে যেন হার।

মোল্লা-বাড়ির বাঁশ ভাল, তার ফাঁপগুলি নয় বড়;
খাঁ-বাড়ির বাঁশ ঢোলা ঢোলা, করছে কড়মড়।
সর্বশেষে পছন্দ হয় শেখের বাড়ির বাঁশ;
ফাঁপগুলি তার কাঠের মত, চেকন-চোকন আঁশ।
বাঁশ কাটিতে যেয়ে রূপাই মারল বাঁশে দা,
তল দিয়ে যায় কাদের মেয়ে-হলদে পাখির ছা!
বাঁশ কাটিতে বাঁসের আগায় লাগল বাঁশের বাড়ি,
চাষী মেয়ের রূপ দেখে তার প্রাণ বুঝি যায় ছাড়ি।
লম্বা বাঁশের লম্বা যে ফাঁপ, আগায় বসে টিয়া,
চাষীদের ওই সোনার মেয়ে কে করিবে বিয়া!
বাঁশ কাটিতে এসে রূপাই কাটল বুকুর চাম,
বাঁশের গায়ে বসে রূপাই ভুল্ল নিজের কাম।
ওই মেয়ে ত তাদের গাঁয়ে বদনা-বিয়ের গানে,
নিয়েছিল প্রাণ কেড়ে তার চিকন সুরের দানে।
“খড়ি^৩ কুড়াও সোনার মেয়ে! শুকনো গাছের ডাল,
শুকনো আমার প্রাণ নিয়ে যাও, দিও আখার জ্বাল।

শুকনো খড়ি কুড়াও মেয়ে! কোমল হাতে লাগে,
তোমায় যারা পাঠায় বনে বোঝেনি কেন আগে?”
এমনিতির কত কথাই উঠে রূপার মনে,
লজ্জাতে সে হয় যে রঙিন পাছে বা কেউ শোনে।
মেয়েটিও ডাগর চোখে চেয়ে তাহার পানে,
কি কথা সে ভাবল মনে সেই জানে তার মানে!

এমন সময় পিছন হতে তাহার মায়ে ডাকে,
“ওলো সাজু! আয় দেখি তোর নথ বেঁধে দিই নাকে!
ওমা! ও কে বেগান^৪ মানুষ বসে বাঁশের ঝাড়ে!”
মাথায় দিয়ে ঘোমটা টানি দেখছে বারে বারে।
খানিক পরে ঘোমটা খুলে হাসিয়া এক গাল,
বলল, “ও কে, রূপাই নাকি? বাঁচবি বহু কাল!
আমি যে তোর হইরে খালা^৫, জানিসনে তুই বুঝি?
মোল্লা-বাড়ির বড়ুরে তোর মার কাছে নিস্ খুঁজি।
তোর মা আমার খেলার দোসর—যাক্গে ওসব কথা,
এই দুপুরে বাঁশ কাটিয়া খাবি এখন কোথা?”

রূপাই বলে, “মা দিয়েছেন কোঁচায় বেঁধে চিড়া”
“ওমা! ও তুই বলিস কিরে? মুখখানা তোর ফিরা!
আমি হেথা থাকতে খালা, তুই থাকবি ভুখে,
শুনলে পরে তোর মা মোরে দুষবে কত রুখে!
ও সাজু, তুই বড় মোরগ ধরগে যেয়ে বাড়ি,
ওই গাঁ হতে আমি এদিক দুধ আনি এক হাঁড়ি।”

চল্ল সাজু বাড়ির দিকে, মা গেল ওই পাড়া।
বাঁশ কাটিতে রূপাই এদিক মারল বাঁশে নাড়া।
বাঁশ কাটিতে রূপার বুক ফেটে বেরোয় গান,
নলী বাঁশের বাঁশীতে কে মারছে যেন টান!
বেছে বেছে কাটল রূপাই ওড়া-বাঁশের গোড়া,
তল্লা-বাঁশের কাটল আগা, কালধোয়ানির জোড়া;
বাল্কে কাটে আল্কে কাটে কপ্তিঃ কাটে শত,
ওদিক বসে রূপার খালা রান্কে মনের মত।

সাজু ডাকে তলা থেকে, “রূপা-ভাইগো এসো”
–এই কথাটি বলতে তাহার লজ্জারো নাই শেষও!
লাজের ভারে হয়তো মেয়ে যেতেই পারে পড়ে,
রূপাই ভাবে হাত দুখানি হঠাৎ যেয়ে ধরে।

যাহোক রূপাই বাঁশ কাটিয়া এল খালার বাড়ি,
বসতে তারে দিলেন খালা শীতল পাটি পাড়ি।
বদনা ভরা জল দিয়ে আর খড়ম দিল মেলে,
পাও দুখানি ধুয়ে রূপাই বসল বামে হেলে।
খেতে খেতে রূপাই কেবল খালার তারিফ করে,
“অনেক দিনই এমন ছালুন^৬ খাইনি কারো ঘরে।”
খালায় বলে, “আমি ত নয় রেঁধেছে তোর বোনে,”
লাজে সাজুর ইচ্ছা করে লুকায় আঁচল-কোণে।
এমনি নানা কথায় রূপার আহার হল সারা,
সন্ধ্যা বেলায় চল্ল ঘরে মাথায় বাঁশের ভার।

খালার বাড়ির এত খাওয়া, তবুও তার মুখ,
দেখলে মনে হয় যে সেথা অনেক লেখা দুখ।
ঘরে যখন ফিরল রূপা লাগল তাহার মনে,
কি যেন তার হয়েছে আজ বাঁশ কাটিতে বনে।
মা বলিল, “বাছারে, কেন মলিন মুখে চাও?”
রূপাই কহে, “বাঁশ কাটিতে হারিয়ে এলেম দাও^৭।”

১) খাম= থাম। ২) গেরো= বাঁধা। ৩) খড়ি= জ্বালানী কাঠ। ৪) বেগান= পর। ৫) খালা= মাসী। ৬) ছালুন= তরকারী। ৭) দাও= দা।

ছয়

ও তুই ঘরে রইতে দিলি না আমারে।

—রাখালী গান।

ঘরেতে রূপার মন টেকে না যে, তরলা বাঁশীর পারা,
কোন্ বাতাসেতে ভেসে যেতে চায় হইয়া আপন হারা।
কে যেন তাহার মনের তরীতে ভাটির করুণ তানে,
ভাটিয়াল সোঁতে ভাসাইয়া নেয় কোন্ সে ভাটার পানে।
সেই চিরকেলে গান আজও গাহে, সুরখানি তার ধরি,
বিগানা গাঁয়ের বিরহিয়া মেয়ে বেয়ে আসে যেন তরী!
আপনার গানে আপনার প্রাণ ছিঁড়িয়া যাইতে চায়,
তবু সেই ব্যথা ভাল লাগে যেন, একই গান পুনঃ গায়।
খেত-খামারে মন বসেনাকো; কাজে কামে নাহি ছিরি,
মনের তাহার কি যে হল আজ ভাবে তাই ফিরি ফিরি।
গানের আসরে যায় না রূপাই সাথীরা অবাক মানে,
সারাদিন বসি কি যে ভাবে তার অর্থ সে নিজে জানে!
সময়ের খাওয়া অসময়ে খায়, উপোসীও কভু থাকে,
“চির দিন তোর কি হল রূপাই” বার বার মায় ডাকে।
গেলে কোনখানে হয়ত সেথাই কেটে যায় সারাদিন,
বসিলে উঠেনা উঠিলে বসেনা, ভেবে ভেবে তনু ক্ষীণ।
সবে হাটে যায় পথ বরাবর রূপা যায় ঘুরে বাঁকা,
খালার বাড়ির কাছ দিয়ে পথ, বাঁশ-পাতা দিয়ে ঢাকা।
পায়ে-পায় ছাই বাঁশ-পাতাগুলো মচ্ মচ্ করে বাজে;
কেউ সাথে নেই, তবু যে রূপাই মরে যায় যেন লাজে।
চোরের মতন পথে যেতে যেতে এদিক ওদিক চায়,
যদিবা হঠাৎ সেই মেয়েটির দুটি চোখে চোখ যায়।
ফিরিবার পথে খালার বাড়ির নিকটে আসিয়া তার,
কত কাজ পড়ে, কি করে রূপাই দেরি না করিয়া আর।
কোনদিন কহে, “খালামা, তোমার জ্বর নাকি হইয়াছে,
ও-বাড়ির ওই কানাই আজিকে বলেছে আমার কাছে।
বাজার হইতে আনিয়াছি তাই আধসেরখানি গজা;”

“বালাই! বালাই! জ্বর হবে কেন? রূপাই করিলি মজা;
জ্বর হলে কিরে গজা খায় কেহ?” হেসে কয় তার খালা,
“গজা খায়নাক, যা হোক এখন কিনে ত হইল জ্বালা;
আচ্ছা না হয় সাজুই খাইবো।” ঠেকে ঠেকে রূপা কহে,
সাজু যে তখন লাজে মরে যায়, মাথা নীচু করে রহে।

কোন দিন কহে, “সাজু কই ওরে, শোনো কিবা মজা, খালা!
আজকের হাটে কুড়ায়ে পেয়েছি দুগাছি পুঁতির মালা;
এক ছোঁড়া কয়, ‘রাঙা সূতো’ নেবে? লাগিবে না কোন দাম;
নিলে কিবা ক্ষতি, এই ভেবে আমি হাত পেতে লইলাম।
এখন ভাবছি, এসব লইয়া কিবা হবে মোর কাজ,
ঘরেতে থাকিলে ছোট বোনটি সে ইহাতে করিত সাজ।
সাজু ত আমার বোনেরই মতন, তারেই না দিয়ে যাই,
ঘরে ফিরে যেতে একটু ঘুরিয়া এ-পথে আইনু তাই।”

এমনি করিয়া দিনে দিনে যেতে দুইটি অরুণ হিয়া,
এ উহারে নিল বরণ করিয়া বিনে-সূতী মালা দিয়া।
এর প্রাণ হতে ওর প্রাণে যেয়ে লাগিল কিসের ঢেউ,
বিভোল কুমার, বিভোল কুমারী, তারা বুঝিল না কেউ।
—তারা বুঝিল না, পাড়ার লোকেরা বুঝিল অনেকখানি,
এখানে ওখানে ছেলে বুড়ো মিলে শুরু হল কানাকানি।

সেদিন রূপাই হাট-ফেরা পথে আসিল খালার বাড়ি,
খালা তার আজ কথা কয়নাক, মুখখানি যেন হাঁড়ি।
“রূপা ভাই এলে?” এই বলে সাজু কাছে আসছিল তাই,
মায় কয়, “ওড়ে ধাড়ী মেয়ে, তোর লজ্জা শরম নাই?”
চুল ধরে তারে গুডুম গুডুম মারিল দু’তিন কিল,
বুঝিল রূপাই এই পথে কোন হইয়াছে গরমিল।

মাথার বোঝাটি না-নামায়ে রূপা যেতেছিল পথ ধরি,
সাজুর মায়ে যে ডাকিল তাহারে হাতের ইশারা করি;
“শোন বাছা কই, লোকের মুখেতে এমন তেমন শুনি,
ঘরে আছে মোর বাড়ন্ত মেয়ে জ্বলন্ত এ আগুনি।

তুমি বাপু আর এ-বাড়ি এসো না।” খালা বলে রোষে রোষে,
“কে কি বলে? তার ঘাড় ভেঙে-দেব!” রূপা কহে দম কসে।
“ও-সবে আমার কাজ নাই বাপু, সোজা কথা ভালবাসি,
সারা গাঁয়ে আজ টি টি পড়ে গেছে, মেয়ে হল কুল-নাশী।”

সাজুর মায়ের কথাগুলি যেন বঁড়শীর মত বাঁকা,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে দিয়ে যায় তীব্র বিষের ধাকা।
কে যেন বাঁশের জোড়-কঞ্চিতে তাহার কোমল পিঠে,
মহারোষ-ভরে সপাং সপাং বাড়ি দিল গিঠে গিঠে।
টলিতে টলিতে চলিল রূপাই একা গাঁর পথ ধরি,
সম্মুখ হতে জোনাকীর আলো দুই পাশে যায় সরি।
রাতের আঁধার গলি ভরা বিষে জমাট বেঁধেছে বুঝি,
দুই হাতে তাহা ঠেলিয়া ঠেলিয়া চলে রূপা পথ খুঁজি।
মাথার ধামায় এখনও রয়েছে দুজোড়া রেশমী চুড়ি,
দুপায়ে তাহারে দলিয়া রূপাই ভাঙিয়া করিল গুঁড়ি।
হাটের সদাই^১ জলীর বিলেতে দুহাতে ছুঁড়িয়া ফেলি,
পথ খুয়ে রূপা বেপথে চলিল, ইটা খেতে^২ পাও মেলি।
চলিয়া চলিয়া মধ্য মাঠেতে বসিয়া কাঁদিল কত,
অষ্টমী চাঁদ হেলিয়া হেলিয়া ওপারে হইল গত।

প্রভাতে রূপাই উঠিল যখন মায়ের বিছানা হতে,
চেহারা তাহার আধা হয়ে গেছে চেনা যায় কোন মতে।
মা বলে, “রূপাই কি হলরে তোর?” রূপাই কহে না কথা
দুখিনী মায়ের পরাণে আজিকে উঠিল দ্বিগুণ ব্যথা।
সাত নয় মার পাঁচ নয় এক রূপাই নয়ন তারা,
এমনি তাহার দশা দেখে মায় ভাবিয়া হইল সারা।
শানাল^৩ পীরের সিন্ধি মানিল খেতে দিল পড়া-পানি,
দেহের দৈন্য দেখিল জননী, দেখিল না প্রাণখানি।
সারা গায়ে মাতা হাত বুলাইল চোখে-মুখে দিল জল,
বুঝিল না মাতা বুকের ব্যথার বাড়ে যে ইহাতে বল।
আজকে রূপার সকলি আঁধার, বাড়া-ভাতে ওড়ে ছাই,
কলঙ্ক কথা সবে জানিয়াছে, কেহ বুঝি বাকি নাই।

জেনেছে আকাশ; জেনেছে বাতাস, জেনেছে বনের তরু;
উদাস-দৃষ্টি যত দিকে চাহে সব যেন শূন্যে মরু।
চারিদিক হতে উঠিতেছে সুর, ধিক্কার! ধিক্কার!!
শাঁখের করাত কাটিতেছে তারে লয়ে কলঙ্ক ধার।
ব্যথায় ব্যথায় দিন কেটে গেল, আসিল ব্যথার সঁজ,
পূবে কলঙ্কী কালো রাত এল, চরণে ঝাঁঝের ঝাঁজ!
অনেক সুখের দুখের সান্ধী বাঁশের বাঁশীটি নিয়ে,
বসিল রূপাই বাড়ির সামনে মধ্য মাঠেতে গিয়ে।

মাঠের রাখাল, বেদনা তাহার আমরা কি অত বুঝি?
মিছেই মোদের সুখ-দুখ দিয়ে তার সুখ-দুখ খুঁজি।
আমাদের ব্যথা কেতাবেতে লেখা, পড়িলেই বোঝা যায়;
যে লেখে বেদনা বে-বুঝ বাঁশীতে কেমন দেখাব তায়?
অনন্তকাল যাদের বেদনা রহিয়াছে শুধু বুক,
এ দেশের কবি রাখে নাই যাহা মুখের ভাষায় টুকে;
সে ব্যথাকে আমি কেমনে জানাব? তবুও মাটিতে কান;
পেতে রহি যদি কভু শোনা যায় কি কহে মাটির প্রাণ!
মোরা জানি খোঁজ বৃন্দাবনেতে ভগবান করে খেলা,
রাজা-বাদশার সুখ-দুঃখ দিয়ে গড়েছি কথার মেলা।
পল্লীর কোলে নিৰ্বাসিত এ ভাইবোনগুলো হয়,
যাহাদের কথা আধ বোঝা যায়, আধ নাহি বোঝা যায়;
তাহাদেরই এক বিরহিয়া বুক কি ব্যথা দিতেছে দোল,
কি করিয়া আমি দেখাইব তাহা, কোথা পাব সেই বোল?
—সে বন-বিহগ কাঁদিতে জানে না, বেদনার ভাষা নাই,
ব্যথের শায়ক বুক বিধিয়াছে জানে তার বেদনাই।

বাজায় রূপাই বাঁশীটি বাজায় মনের মতন করে,
যে ব্যথা বুক ধরিতে পারেনি সে ব্যথা বাঁশীতে ঝরে।

‘আমি কেনে বা পিরীতির করলাম।

(আমার ভাবতে জনম গেলরে,

আমার কানতে জনম গেলরে)

সে ত সীতার সিন্দুর নয় তারে আমি কপালে পরিব,

সে ত ধান নয় চাউল নয় তারে আমি ডোলেতে ভরিবরে,

আমি কেনেবা পিরীতিরে করলাম।
আগে যদি জানতাম আমি প্রেমের এত জ্বালা,
ঘর করতাম কদম্বতলা, রহিতাম একেলারে;
আমি কেনেবা পিরীতিরে করলাম।’

—মুর্শিদা গান

বাজে বাঁশী বাজে, তারি সাথে সাথে দুলিছে সাঁজের আলো;
নাচে তালে তালে জোনাকীর হারে কালো মেঘে রাত-কালো।
বাজাইল বাঁশী ভাটিয়ালী সুরে বাজাল উদাস সুরে,
সুর হতে সুর ব্যথা তার যেন চলে যায় কোন্ দূরে!
আপনার ভাবে বিভোল পরাণ, অনন্ত মেঘ-লোকে,
বাঁশী হতে সুরে ভেসে যায় যেন, দেখে রূপা দুই চোখে।
সেই সুর বেয়ে চলেছে তরুণী, আউলা মাথার চুল,
শিথিল দুখান বাহু বাড়াইয়া ছিঁড়িছে মালার ফুল।
রাঙা ভাল্ হতে যতই মুছিছে ততই সিঁদুর জ্বলে;
কখনও সে মেয়ে আগে আগে চলে, কখনও বা পাছে চলে।
খানিক চলিয়া থামিল তরুণী আঁচলে ঢাকিয়া চোখ,
মুছিতে মুছিতে মুছিতে পারে না, কি যেন অসহ শোক!
করণ তাহার করুণ কান্না আকাশ ছাইয়া যায়,
কি যেন মোহের রঙ ভাসে মেঘে তাহার বেদন-ঘায়।

পুনরায় যেন খিলখিল করে একগাল হাসি হাসে,
তারি চেউ লাগি গগনে গগনে তড়িতের রেখা ভাসে।
কখনও আকাশ ভীষণ আঁধার, সব গ্রাসিয়াছে রাহু,
মহাশূন্যের মাঝে ভেসে উঠে যেন দুইখানি বাহু!
দোলে-দোলে বাহু তারি সাথে যেন দোলে-দোলে কত কথা,
“ঘরে ফিরে যাও মোর তরে তুমি সহিও না আর ব্যথা।”
মুহূর্ত পরে সেই বাহু যেন শূন্যে মিলায় হয়—
রামধনু বেয়ে কে আসে ও মেয়ে, দেখে যেন চেনা যায়!
হাসি হাসি মুখ গলিয়া গলিয়া হাসি যায় যেন পড়ে,
সারা গায়ে তার রূপ ধরেনাক, পড়িছে আঁচল ঝরে।
কণ্ঠে তাহার মালার গন্ধে বাতাস পাগল পারা,
পায়ে রিনি বিনি সোনার নূপুর বাজিয়া হইছে সারা;

হঠাৎ কে এলো ভীষণ দস্যু-ধরি তার চুল মুঠি,
কোন্ আন্ধার গ্রহপথ বেয়ে শূন্যে সে গেল উঠি।
বাঁশী ফেলে দিয়ে ডাক ছেড়ে রূপা আকাশের পানে চায়,
আধা চাঁদখানি পড়িছে হেলিয়া সাজুদের ওই গাঁয়।
শূন্যে মাঠে রূপা গড়াগড়ি যায়, সারা গায়ে ধূলো মাখে,
দেহেরে ঢাকিছে ধূলো মাটি দিয়ে, ব্যথারে কি দিয়ে ঢাকে!

- ১) সদাই= সওদা।
- ২) ইটা খেত= চষা খেত।
- ৩) শানাল= পূর্ব বঙ্গের বিখ্যাত পীর শাহলাল।

BANGLADARSHAN.COM

সাত

‘ঘটক চলিল চলিল সূর্য সিংহের বাড়িরে।’

–আসমান সিংহের গান

কান্-কানা-কান্ ছুটল কথা গুন্-গুনা-গুন্ তানে,
শোন্-শোনা-শোন্ সবাই শোনে, কিন্তু কানে কানে।
“কি করগো রূপার মতো? খাইছ কানের মাতা?
ও-দিক যে তোর রূপার নামে রটছে গাঁয়ে যা তা!
আমরা বলি রূপাই এমন সোনার-কলি ছেলে,
তার নামে হয় এমন কথা দেখব কি কাল গেলে?”
এই বলিয়া বড়াই বুড়ী বসল বেড়ি দোর,
রূপার মা কয়, “বুঝিনে বোন কি তোর কথার ঘোর!”
বুড়ী যেন আচম্কা হয় আকাশ হতে পড়ে,
“সবাই জানে তুই না জানিস যে কথা তোর ঘরে?”
ও-পাড়ার ও ডাগর ছুঁড়ী, শেখের বাড়ির ‘সাজু’,
তারে নাহি তোর ছেলে সে গড়িয়ে দেছে বাজু।
ঢাকাই শাড়ী কিন্যা দিছে, হাঁসলী দিছে নাকি,
এত করে এখন কেন শাদীর রাখিস বাকি?”
রূপার মা কয়, “রূপা আমার এক-রত্তি ছেলে,
আজও তাহার মুখ ঝুঁকিলে দুধের ঘিরাণ মেলে।
তার নামে যে এমন কথা রটায় গাঁয়ে গাঁয়ে,
সে যেন তার বেটার মাথা চিবায় বাড়ি যায়ে।”
রূপার মায়ের রুঠা কথায় উঠল বুড়ীর কাশ,
একটু দিলে তামাক পাতা, নিলেন বুড়ী শ্বাস।
এমন সময় ওই গাঁ হতে আসল খেঁদির মাতা,
টুনির ফুপু^১ আসল হাতে ডলতে তামাক পাতা।
ক’জনকে আর থামিয়ে রাখে? বুঝল রূপার মা;
রূপা তাহার সত্যি করেই এতটুকুন না।
বুঝল মায়ে কেন ছেলে এমন উদাস পারা,
হেথায় হোথায় কেবল ঘোরে হয়ে আপন হারা।

ওপাড়ার ও দুখাই মিঞা ঘটকালিতে পাকা,
সাজুর সাথেই জুড়ুক বিয়ে যতকে লাগুক টাকা।

শেখ বাড়িতে যেয়ে ঘটক বেকী-বেড়ার কাছে,
দাঁড়িয়ে বলে, “সাজুর মাগো, একটু কথা আছে।”

সাজুর মায়ে বসতে তারে এনে দিলেন পিড়ে,
ডাব্বা হুঁকা লাগিয়ে বলে, “আস্তুে টান ধীরে।”

ঘটক বলে, ‘সাজুর মাগো মেয়ে তোমার বড়,
বিয়ের বয়স হলো এখন ভাবনা কিছু কর।’

সাজুর মা কয়, “তোমরা আছ ময়-মুরগি ভাই,
মেয়ে মানুষ অত শত বুঝি কি আর ছাই!

তোমরা যা কও ঠেলতে কি আর সাধ্য আছে মোর?”

ঘটক বলে, “এই ত কথা, লাগবে না আর ঘোর।

ও-পাড়ার ও রূপারে ত চেনই তুমি বোন,

তার সাথে দাও মেয়ের বিয়ে ঠিক করিয়ে মন।”

সাজুর মা কয়, “জান ত ভাই! রটছে গাঁয়ে যা তা,
রূপার সাথে বিয়ে দিলে থাকবে না আর মাথা।”

ঘটক বলে, “কাঁটা দিয়েই তুলতে হবে কাঁটা,
নিন্দা যারা করে তাদের পড়বে মুখে ঝাঁটা।

রূপা ত আর নয় এ গাঁয়ে যেমন তেমন ছেলে,

লক্ষ্মীরে দেই বউ বানিয়ে অমন জামাই পেলে।”

ঠাটে ঘটক কয় গো কথা ঠোঁট-ভরাভর হাঁসে;

সাজুর মায়ের পরাণ তারি জোয়ার-জলে ভাসে।

“দশ খান্দা জমি রূপার, তিনটি গরু হালে,

ধানের-বেড়ী ঠেকে তাহার বড় ঘরের চালে।

সাজু তোমার মেয়ে যেমন, রূপাও ছেলে তেমন,

সাত গেরামের ঘটক আমি জোড় দেখিনি এমন।”

তার পরেতে পাড়ুল ঘটক রূপার কুলের কথা,

রূপার দাদা ‘র’ নাম শুনে লোক কাঁপত যথা তথা।

রূপার নানা সোয়েদ-ঘেঁষা, মিঞাই বলা যায়—

কাজী বাড়ির প্যায়দা ছিল কাজল-তলার গাঁয়।

রূপার বাপের রাখত খাতির গাঁয়ের চৌকিদারে,
আসেন বসেন মুখের কথা-গান বাজিত তারে।
রূপার চাচা অছিমদী, নাম শোন নি তার?
ইংরেজী তার বোল শুনিলে সব মানিত হার।
কথা ঘটক বল্ল এঁটে, বল্ল কখন টিলে,
সাজুর মায়ে সবগুলি তার ফেল্ল যেন গিলে।

মুখ দেখে তার বুঝল ঘটক-লাগছে ওষুধ হাড়ে,
বল্ল “তোমার সাজুর বিয়া ঠিক কর এই বারো।”
সাজুর মা কয়, “যা বোঝ ভাই, তোমরা গ্যা তাই কর,
দেখো যেন কথার আবার হয় না নড়চড়।”
“আউ ছিছি!” ঘটক বলে, “শোনই কথা বোন,
তোমার সাজুর বিয়া দিতে লাগবে কত পণ?
পোণে দিব কুড়ি দেড়েক বায়না দেব তেরো,
চিনি সন্দেশ আগোড়-বাগোড় এই গে ধরো বারো।
সবদ্যা^৩ হল দুই কুড়ি এ নিতেই হবে বোন,
চাইলে বেশী জামাইর তোমার বেজার হবে মন।”
সাজুর মা কয়, “ও-সব কথার কি-ইবা আমি জানি,
তোমরা যা কও তাইত খোদার শুকুর বলে মানি।”
সাধে বলে দুখাই ঘটক ঘটকালিতে পাকা,
আদ্য মধ্য বিয়ের কথা সব করিব ফাঁকা।

চল্-চলা-চল্ চল্ল দুখাই পথ বরাবর ধরি,
তাগ্-ধিনা-ধিন্ নাচে যেন গুন্‌গুনা গান করি।
দুখাই ঘটক নেচে চলে নাচে তাহার দাড়ি,
বুড়ো বটের শিকড় যেন চলছে নাড়ি নাড়ি;
লক্ষ্ লক্ষ্ চলে ঘটক দস্ত করে চায়,
লুটের মহল দখল করে চলছে যেন গাঁয়!
ঘটকালিরই টাকা যেন বন্-বনা-বন্ বাজে,
হন্-হনা-হন্ চল্ল ঘটক একলা পথের মাঝে।
ধানের জমি বাঁয়ে ফেলিয়া, ডাইনে ঘন পাট,
জলীর বিলে নাও বাঁধিয়া ধরল গাঁয়ের বাট।

“কি কর গো রূপার মাতা, ভাবছ বসি কিবা,
সাজুর সাথেই ঠিক কইরাছি তোমার ছেলের বিবা^৪।
সহজে কি হয় সে রাজি, একশ টাকা পণ,
এর কমেতে বসেইনাক সাজুর মায়ের মন।

আমিও আবার কুড়ি তিনেক উঠিয়ে তার পরে,
সাজুর মায়ও নাছোড়-বান্দা, দিলাম তখন ধরে;
আরেক কুড়ি, তয়^৫ সে কথা কইল হাসি হাসি,
আমি ভাবি, বিয়ার বুঝি বাজল সানাই বাঁশী।
এখন বলি, রূপার মাতা, আড়াই কুড়ি টাকা,
মোর কাছেতে দিবা, কথা হয় না যেন ফাঁকা!
আসব্ দিয়ে গোপনে তায়, নইলে গাঁয়ের লোক,
মেজবানী^৬ দাও বলে তারে ধরবে চীনে-জোকো।
বিয়ের দিনে নিবে সে তাই তিরিশ টাকা যেচে,
যারে তারে বলতে পার এই কথাটি নেচে।

চিনি সন্দেহ আগোড় বাগোড় তার লাগিবে ষোলো,
এই ধরগ্যা রূপার বিয়া আজই যেন হল।”

রূপার মায়ের আহ্বাদে প্রাণ ধরেইনাক আর,
ইচ্ছা করে নেচে নেচে বেড়ায় বারে বার।
“ও রূপা, তুই কোথায় গেলি? ভাবিস্নাক মোটে,
কপাল গুণে বিয়ে যে তোর সাজুর সাথেই জোটে।”
এই বলিয়া রূপার মাতা ছুটল গাঁয়ের পানে,
ঘটক গেল নিজের বাড়ি গুন্-গুনা-গুন গানে।

- ১) ফুপু= পিসী, বাপের বোন।
- ২) দাদা= ঠাকুরদাদা।
- ৩) সবদ্যা= সব দিয়া।
- ৪) বিবা= বিবাহ।
- ৫) তয়= তবে।
- ৬) মেজবানী= নিয়ন্ত্রণ দেওয়া।

আট

“কি কর দুল্যাপের মালো; বিভাবনায় বসিয়া,
আসত্যাছে বেটীর দামান ফুল পাগড়ী উড়িয়া নারে।”
“আসুক আসুক বেটীর দামান কিছুর চিন্তা নাইরে,
আমার দরজায় বিছায়া থুইছি কামরাঙা পাটা নারে।
সেই ঘরেতে নাগায়া থুইছি মোমের সস্র^১ বাতি,
বাইর বাড়ি বান্দিয়া থুইছি গজমতী হাতী নারে।”

—মুসলমান মেয়েদের বিবাহের গান

বিয়ের কুটুম এসেছে আজ সাজুর মায়ের বাড়ি,
কাছারী ঘর গুম্-গুমা-গুম্, লোক হয়েছে ভারি।
গোয়াল-ঘরে ঝেড়ে পুছে বিছান দিল পাতি;
বসল গাঁয়ের মোল্লা মোড়ল গল্প-গানে মাতি।
কেতাব পড়ার উঠল তুফান;—চম্পা কালু গাজী,
মামুদ হানিফ সোনাবান ও জয়গুণ বিবি আজি,
সবাই মিলে ফির্ছে যেন হাত ধরাধর করি,
কেতাব পড়ার সুরে সুরে চরণ ধরি ধরি।
পড়ে কেতাব গাঁয়ের মোড়ল নাচিয়া ঘন দাড়ি,
পড়ে কেতাব গাঁয়ের মোল্লা মাঠ-ফাটা ডাক ছাড়ি।

কৌতূহলী গাঁয়ের লোকে শুন্ছে পেতে কান,
জুমজুমেরি^১ পানি যেন করছে তারা পান!
দেখছে কখন মনের সুখে মামুদ হানিফ যায়,
লাল ঘোড়া তার উড়ছে যেন লাল পাখিটির প্রায়।
কাতার কাতার সৈন্য কাটে যেমন কলার বাগ,
মেঘের পালে পড়ছে যেন সুন্দর-বুনো বাঘ!
স্বপন দেখে, জয়গুণ বিবি পালঙ্কেতে শুয়ে,
মেঘের বরণ চুলগুলি তার পড়ছে এসে ভুঁয়ে;
আকাশেরি চাঁদ সূরুজে মুখ দেখে পায় লাজ,
সেই কনেরে চোখের কাছে দেখছে চাষী আজ।
দেখছে চোখে কারবালাতে ইমাম হোসেন মরে,
রক্ত যাহার জম্ছে আজো সন্ধ্যা-মেঘের গোরে;

কারবালারি ময়দানে সে ব্যথার উপাখ্যান;
সারা গাঁয়ের চোখের জলে করিয়া গেল সান।

উঠান পরে হুলা-করে পাড়ার ছেলে মেয়ে
রঙিন বসন উড়ছে তাদের নধর তনু ছেয়ে।
কানা-ঘুমা করত যারা রূপার স্বভাব নিয়ে,
ঘোর কলিকাল দেখে যাদের কানত সদা হিয়ে;
তারাই এখন বিয়ের কাজে ফির্ছে সবার আগে,
ভাঙা-গড়ার সকল কাজেই তাদের সমান লাগে।
বউ-ঝিরা সব রান্না-বাড়ায় ব্যস্ত সকল ক্ষণ;
সারা বাড়ি আনন্দ আজ খুশী সবার মন।
বাহিরে আজ এই যে আমোদ দেখছে জনে জনে;
ইহার চেয়ে দ্বিগুণ আমোদ উঠছে রূপার মনে।
ফুল পাগড়ী মাথায় তাহার ‘জোড়া জামা’ গায়,
তেল-কুচ্-কুচ্ কালো রঙে বলক দিয়ে যায়।
বউ-ঝিরা সব ঘরের বেড়ার খানিক করে ফাঁক,
নতুন দুলার^৩ রূপ দেখি আজ চক্ষে মারে তাক।

এমন সময় শোর উঠিল-বিয়ের যোগাড় কর,
জলদি করে দুলার মুখে পান শরবত ধর^৪।
সাজুর মামা খটকা লাগায়, “বিয়ের কিছু গৌণ,
সাদার পাতা^৫ আনেনি তাই বেজায় সবার মন।”
রূপার মামা লক্ষ্মে দাঁড়ায় দম্ভে চলে বাড়ি;
সেরেক পাঁচেক সাদার পাতা আন্ল তাড়াতাড়ি।
কনের খালু^৬ উঠিয়া বলে “সিদুর হল উনা।”
রূপার খালু আনিয়া দিল যা লাগে তার দুনা!
কনের চাচার মন উঠে না, “খাটো হয়েছে শাড়ী।”
রূপার চাচা দিল তখন ‘ইংরেজী বোল ছাড়ি।’
‘কিরে বেটা বকিস নাকি?’ কনের চাচা হাঁকে,
জালি কলার পাতার মত গা কাঁপে তার রাগে।
“কোথায় গেলি ছদন চাচা, ছমির শেখের নাতি,
দেখিয়া দেই দুলার চাচার কতই বুকের ছাতি!

বেরো বেটা নওশা^৭ নিয়ে, দিব না আজ বিয়া;”
বলতে যেন আগুন ছোটে চোখ দুটি তার দিয়া
বরপক্ষের লোকগুলি সব আর যে বরের চাচা,
পালিয়ে যেতে খুঁজছে যেন রশুই ঘরের মাচা।

মোড়ল এসে কনের চাচায় অনেক করে বলে,
খামিয়ে তারে বিয়ের কথা পাড়েন কুতূহলে।
কনের চাচা বসল এসে বরের চাচার কাছে,
কে বলে ঝড় এদের মাঝে হয়েছে যে পাছে!
মোল্লা তখন কলমা পড়ায় সাক্ষী-উকিল^৮ ডাকি,
বিয়ে রূপার হয়ে গেল, ক্ষীর-ভোজনী বাকি!
তার মাঝেতে এমন-তেমন হয়নি কিছু গোল,
কেবল একটি বিষয় নিয়ে উঠল হাসির রোল।
এয়োরা সব ক্ষীর ছোঁয়ায়ে কনের ঠোঁটের কাছে;
সে ক্ষীর আবার ধরল যখন রূপার ঠোঁটের পাছে;
রূপা তখন ফেলল খেয়ে ঠোঁট-ছোঁয়া সেই ক্ষীর,
হাসির তুফান উঠল নেড়ে মেয়ের দলের ভীড়।
ভাবল রূপাই-ওমন ঠোঁটে যে ক্ষীর গেছে ছুঁয়ে,
দোজখ যাবে না খেয়ে তা ফেলবে যে জন ভুঁয়ে।

১) সস্র= সহস্র।

২) জুমজুম= আরবের একটি পবিত্র কূপ।

৩) দুলা= বর।

৪) পান শরবত ধর= বিবাহের আগে বরকে শরবত খাওয়ান হয়।

৫) সাদার খাতা= তামাক পাতা।

৬) খালু= মেশোমশায়।

৭) নওশা= বর।

৮) সাক্ষী উকিল= মুসলমানদের বিবাহের সময় বর-কন্যা একস্থানে থাকে না। কন্যা-পক্ষের একজন উকিল এবং দুইজন সাক্ষী থাকেন।

তাহারা বাড়ির ভিতরে যাইয়া বিবাহে কন্যার মত আছে কিনা জানিয়া আসেন। উকিল জিজ্ঞাসা করেন, সাক্ষীরা তাহা শুনিয়া আসিয়া বাহিরে বৈঠকখানায় বিবাহ সভার সকলকে জানান।

নয়

মৎস চেনে গহিন গম্ভ পঞ্জী চেনে ডাল;
মায় সে জানে বিটার দরদ যার কলিজার শ্যাল!
নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ;
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।

—গাজীর গান

আষাঢ় মাসে রূপার মায়ে মরল বিকার জুরে,
রূপা সাজু খায়নি খানা সাত আটদিন ধরে।
লালন পালন যে করিত 'ঠোটের' আধার দিয়া,
সেই মা আজি মরে রূপার ভাঙল সুখের হিয়া।
ঘাম্লে পরে যে তাহারে করত আবের পাখা;
সেই শ্বাশুড়ী মরে, সাজুর সব হইল ফাঁকা।
সাজু রূপা দুই জনেতে কান্দে গলাগলি;
গাছের পাতা যায় যে ঝরে, ফুলের ভাঙে কলি।
এত দুখের দিনও তাদের আস্তে হল গত,
আবার তারা সুখেরি ঘর বাঁধল মনের মত।

BANGLADARSHAN.COM

দশ

বড় ঘর বান্দাছাও মোনাতাই বড় করছাও আশা
রজনী প্রভাতের কালে পঞ্জী ছাড়বে বাসা।

—মুর্শিদা গান

নতুন চাষা ও নতুন চাষাণী পাতিল নতুন ঘর,
বাবুই পাখিরা নীড় বাঁধে যথা তালের গাছের পর।
মাঠের কাজেতে ব্যস্ত রূপাই, নয়া বউ গেহ কাজে,
দুইখান হতে দুটি সুর যেন এ উহারে ডেকে বাজে।
ঘর চেয়ে থাকে কেন মাঠ পানে, মাঠ কেন ঘর পানে,
দুইখানে রহি দুইজন আজি বুঝিছে ইহার মানে।

আশ্বিন গেল, কার্তিক মাসে পাকিল খেতের ধান,
সারা মাঠ ভরি গাহিছে কে যেন হলদি-কোটার গান।
ধানে ধান লাগি বাজিছে বাজনা, গন্ধ উড়িছে বায়,
কলমীলতায় দোলন লেগেছে, হেসে কূল নাহি পায়।
আজো এই গাঁও অঝোরে চাহিয়া ওই গাঁওটির পানে,
মাঝে মাঠখানি চাদর বিছায়ে হলুদ বরণ ধানে।

আজকে রূপার বড় কাজ-কাজ-কোন অবসর নাই,
মাঠে যেই ধান ধরেনাক আজি ঘরে দেবে তারে ঠাই।
সারা মাঠে ধান, পথে ঘাটে ধান উঠানেতে ছড়াছড়ি,
সারা গাঁও ভরি চলেছে কে কবি ধানের কাব্য পড়ি।
আজকে রূপার মনে পড়েনাক শাপলার লতা দিয়ে,
নয়া গৃহিণীর খোঁপা বেঁধে দিত চুলগুলি তার নিয়ে।
সিঁদুর লইয়া মান হয়নাক বাজে না বাঁশের বাঁশী,
শুধু কাজ-কাজ, কি যাদু-মন্ত্র ধানেরা পড়িছে আসি।
সারাটি বরষা কে কবি বসিয়া বেঁধেছে ধানের গান,
কত সুদীর্ঘ দিবস রজনী করিয়া সে অবসান।
আজিকে তাহার মাঠের কাব্য হইয়াছে বুঝি সারা,
ছুটে গৈয়ো পাখি ফিঙে বুলবুল তারি গানে হয়ে হারা।
কৃষাণীর গায়ে গহনা পরায় নতুন ধানের কুটো;

এত কাজ তবু হাসি ধরেনাক, মুখে ফুল ফুটো ফুটো!
আজকে তাহার পাড়া-বেড়ানর অবসর মোটে নাই,
পার খাড়া গাছি কোথা পড়ে আছে, কেবা খোঁজ রাখে ছাই!

অর্ধেক রাত উঠোনেতে হয় ধানের মলন মলা,
বনের পশুরা মানুষের কাজে মিশায় গলায় গলা।
দাবায় শুইয়া কৃষাণ ঘুমায়, কৃষাণীর কাজ ভারি,
ঢেকির পারেতে মুখর করিছে একেলা সারাটি বাড়ি।
কোন দিন চাষী শুইয়া শুইয়া গাহে বিরহের গান,
কৃষাণের নারী ঘুমাইয়া পড়ে, ঝাড়িতে ঝাড়িতে ধান।
হেমন্ত চাঁদ অর্ধেক হেলি জ্যোৎস্নার জাল পাতি,
টেনে টেনে তারে হয়রান হয়ে ডুবে যায় রাতরাতি।

এমনি করিয়া ধানের কাব্য হইয়া আসিল সারা,
গানের কাব্য আরম্ভ হল সারাটা কৃষাণ পাড়া!

রাতে উহারা মানিবে না যেন, নতুন গলার গানে,
বাঁশী বাজাইয়া আজকে রাতের করিবে নতুন মানে।
আজিকে রূপার কোন কাজ নাই, ঘুম হতে যেন জাগি,
শিয়রে দেখিছে রাজার কুমারী তাহারই ব্যথার ভাগী।
সাজুও দেখিছে কোথাকার যেন রাজার কুমার আজি,
ঘুম হতে তার সবে জাগিয়েছে অরুণ-আলোয় সাজি।
নতুন করিয়া আজিকে উহারা চাহিছে এ ওর পানে,
দীর্ঘ কাজের অবসর যেন কহিছে নতুন মানে!
নতুন চাষার নতুন চাষাণী নতুন বেঁধেছে ঘর,
সোহাগে আদরে দুটি প্রাণ যেন করিতেছে নড়বড়।
বাঁশের বাঁশীতে ঘুণ ধরেছিল, এত দিন পরে আজ,
তেলে জলে আর আদরে তাহার হইল নতুন সাজ।
সন্ধ্যার পরে দাবায় বসিয়া রূপাই বাজায় বাঁশী,
মহাশূন্যের পথে সে ভাষায় শূন্যের সুররাশি!

ক্রমে রাত বাড়ে, বউ বসে দূরে, দুটি চোখ ঘুমে ভার,
“পায়ে পড়ি ওগো চলো শুতে যাই, ভাল লাগেনাক আর।”
রূপা ত সে কথা শোনেইনি যেন, বাঁশী বাজে সুরে সুরে,

‘ঘরে দেখে যারে সেই যেন আজি ফেরে ওই দূরে দূরে।’
বউ রাগ করে, “দেখ, বলে রাখি, ভাল হবেনাক পরে,
কালকের মত করি যদি তবে দেখিও মজাটি করে।
ওমনি করিয়া সারারাত আজি বাজাইবে যদি বাঁশী,
সিঁদুর আজিকে পরিব না ভালে, কাজল হইবে বাসি।
দেখ, কথা শোন, নইলে এখনি খুলিব কানের দুল,
আজকে ত আমি খোঁপা বাঁধিব না, আলগা রহিবে চুল।”

বেচারী রূপাই বাঁশী বাজাইতে এমনি অত্যাচার,
কৃষ্ণাণের ছেলে! অত কিবা বোঝে, তখনই মানিল হার।
কহে জোড় করে, “শোন গো হুজুর, অধম বাঁশীর প্রতি,
মৌন থাকার কঠোর দণ্ড অন্যায় এ যে অতি।

আজকে ও-ভালে সিঁদুর দিবে না, খুলিবে কানের দুল,
সন্ধ্যা হবে না সিঁদুরে রঙের-ভোরে হাসিবে না ফুল।

এত বড় কথা! আচ্ছা দেখাই, ওরে ও অধম বাঁশী,
এই তরণীর অধরের গানে তোমার হইবে ফাঁসী।”

হাতে লয়ে বাঁশী বাজাইল রূপা মাঠের চিকন সুরে,
কভু দোলাইয়া বউটির ঠোঁটে কভু তারে ঘুরে ঘুরে।
বউটি যেন গো হেসে হয়রান, কহে ঠোঁটে ঠোঁট চাপি,
“বাঁশীর দণ্ড হইল, কিন্তু যে বাজাল সেই পাপী?”

পুনঃ জোর করে রূপা কহে, “এই অধমের অপরাধ,
ভয়ানক যদি, দণ্ড তাহার কিছু কম নিতে সাধ!”

রূপার বলার এমনি ভঙ্গী বউ হেসে কুটি কুটি,
কখনও পড়িছে মাটিতে ঢলিয়া, কভু গায়ে পড়ে লুটি।

পরে কহে, “দেখো, আরও কাছে এসো, বাঁশীটি লও ত হাতে,
এমনি করিয়া দোলাও ত দেখি নোলক দোলার সাথে!”

বাঁশী বাজে আর নোলক যে দোলে, বউ কহে আর বার,
“আচ্ছা আমার বাহুটি নাকিগো সোনালী-লতার হার?

এই ঘুরালেম, বাজাও ত দেখি এরি মত কোন সুর,”
তেমনি বাহুর পরশের মত বাজে বাঁশী সুমধুর!

দুটি করে রাঙা ঠোঁটখানি টেনে কহে বউ, “এরি মত,

তোমার বাঁশীতে সুর যদি থাকে বাজাইলে বেশ হত।”
চলে মেঠো বাঁশী দুটি ঠোট ছুঁয়ে কলমী ফুলের বুকু,
ছোট চুমু রাখি চলে যেন বাঁশী, চলে সে যে কোন লোকে।
এমনি করিয়া রাত কেটে যায়; হাসে রবি ধীরে ধীরে,
বেড়ার ফাঁকেতে উঁকি মেরে দেখি দুটি খেয়ালীর ছিри।

সেদিন রাত্রে বাঁশী শুনে শুনে বউটি ঘুমায়ে পড়ে,
তারি রাঙা মুখে বাঁশী-সুরে রূপা বাঁকা-চাঁদ এনে ধরে।
তারপরে, খুলে চুলের বেণীটি বার বার করে দেখে,
বাহুখানি দেখে নাড়িয়া নাড়িয়া বুকুর কাছেতে রেখে।
কুসুম-ফুলেতে রাঙা পাও দুটি দেখে আরো রাঙা করি,
মৃদু তালে তালে নিঃশ্বাস লয়, শুনে মুখে মুখ ধরি।
ভাবে রূপা, ও-যে দেহ ভরি যেন এনেছে ভোরের ফুল,
রোদ উঠিলেই শুকাইয়া যাবে, শুধু নিমিষের ভুল!

হায় রূপা, তুই চোখের কাজলে আঁকিলি মোহন ছবি,
এতটুকু ব্যথা না লাগিতে যেরে ধুয়ে যাবে তোর সবি!
ওই বাহু আর ওই তনু-লতা ভাসিছে সোঁতের ফুল,
সোঁতে সোঁতে ও যে ভাসিয়া যাইবে ভাঙিয়া রূপার কূল!

বাঁশী লয়ে রূপা বাজাতে বসিল বড় ব্যথা তার মনে,
উদাসীয়া সুর মাথা কুটে মরে তাহার ব্যথার সনে।
ধারায় ধারায় জল ছুটে যায় রূপার দুচোখ বেয়ে,
বউটি তখন জাগিয়া উঠিল তাহার পরশ পেয়ে।

“ওমা ওকি? তুমি এখনো শোওনি! খোলা কেন মোর চুল?
একি! দুই পায়ে কে দেছে ঘষিয়া রঙিন কুসুম ফুল?
ওকি! ওকি!! তুমি কাঁদছিলে বুঝি! কেন কাঁদছিলে বল?”
বলিতে বলিতে বউটির চোখ জলে করে ছল ছল!

বাহুখানা তার কাঁধ পরে রাখি রূপা কয় মৃদু সুরে,
“শোন শোন সই, কে যেন তোমায় নিয়ে যেতে চায় দূরে!
“সে দূর কোথায়?” “অনেক-অনেক-দেশ যেতে হয় ছেড়ে,
সেথা কেউ নাই শুধু তুমি আর সেই সে অচেনা ফেরে।
তুমি ঘুমাইলে সে এসে আমায় কয়ে যায় কানে কানে,

যাই-যাই-ওরে নিয়ে যাই আমি আমার দেশের পানে।
বল, তুমি সেথা কখন যাবে না, সত্য করিয়া বল!”
“নয়! নয়! নয়!” বউ কহে তার চোখ দুটি ছলছল।

রূপা কয় “শোন সোনার বরণি, আমার এ কুঁড়ে ঘর,
তোমার রূপের উপহাস শুধু করে সারাদিন ভর।
তুমি ফুল! তবে ফুলের গায়েতে বহে বিহানের বায়ু,
আমি কাঁদি সই রোদ উঠিলে যে ফুরাবে রঙের আয়ু।
আহা আহা সখি, তুমি যাহা কর, মোর মনে লয় তাই,
তোমার ফুলের পরাণে কেবল দিয়ে যায় বেদনাই।”

এমন সময় বাহির হইতে বহির মামুর ডাকে,
ধড়মড় করি উঠিয়া রূপাই চাহিল বেড়ার ফাঁকে।

BANGLADARSHAN.COM

এগারো

সাজ সাজ বলিয়ারে শহরে পৈল সাড়া
সাত হাজার বাজে ঢোল চৌদ্দ হাজার কাড়া।
প্রথমে সাজিল মর্দ আহুদি ডগরী,
পাঁচ কাটা ভুঁই জুইডো বসে মর্দ এয়সা ভারি।
তারপরে, সাজিল মর্দ তুরুক আমানি,
সমুদুরে নামলে তার হৈত আঁটপানি।
তারপরে সাজিল মর্দ নামে লোহাজুড়ী
আছড়াইয়া মারত সে হাতীর ঙুঁড় ধরি।
তারপরে সাজিল মর্দ নামে আইন্দ্যা ছাইন্দ্যা,
বাইশ মণ তামাক নেয় তার লেংটির মধ্যে বাইন্ধ্যা।
তারপরে সাজিল মর্দ নামে মদন ঢুলি,
বাইশ মণ পিতল তার ঢোলের চারটি খুলী।
আতালী পাতালী সাজে গগনেরী ঠাটা,
মেঘনাল সাজিয়া আইল তাম তুরুকের বেটা।
তুগুলি মুগুলি সাজে তার দুই ভাই,
ঐরাবতে সাইজা আইল আজদাহা সেপাই।
বন্দুকি বন্দুকি চলে কামানে কামান,
ময়ূর-ময়ূরী চলে ধরিয়া পয়গাম।

—মহরমের জারী

“ও রূপা তুই করিস্ কিরে? এখনো তুই রইলি শুয়ে?
বন-গেঁয়োরা ধান কেটে নেয় গাজনা-চরের খামার ভুঁয়ো।”
“কি বলিলা বছির মামু?” উঠিল রূপাই হাঁক ছাড়িয়া,
আগুনভরা দুচোখ হতে গোল্লা-বারুদ যায় উড়িয়া।
পাটার মত বুকখানিতে থাপড় মারে শাবল হাতে,
বুকের হাড়ে লাগল বাড়ি, আগুন বুঝি জ্বলবে তাতে।
লক্ষ্মে রূপা আনলো পেরে চাং হতে তার সড়কি খানা,
ঢাল বুলায়ে মাজার সাথে থালে থালে মারল হানা।
কোথায় রল রহম চাচা, কলম শেখ আর ছমির মিঞা,
সাউদ পাড়ার খাঁরা কোথায়? কাজীর পোরে^১ আন ডাকিয়া?
বন-গেঁয়োরা ধান কেটে নেয় থাকতে মোরা গফর-গাঁয়ে,
এই কথা আজ শোনার আগে মরিনি ক্যান্ গোরের ছায়ে?
‘আলী-আলী^২’ হাঁকল রূপাই, হুঙ্কারে তার গগন ফাটে,

হুঙ্কারে তার গর্জে বহির আশুন যেন ধরল কাঠে!
ঘুম হতে সব গাঁয়ের লোকে শুনল যেন রূপার বাড়ি;
আকাশ হতে ভাঙছে ঠাটা^১, মেঘে মেঘে লাগছে বাড়ি।
ডাক শুনে তার আসল ছুটে রহম চাচা, ছমির মিঞা,
আসল হেঁকে কাজেম খুনী নখে নখে আঁচড় দিয়া।
আসল হেঁকে গাঁয়ের মোড়ল মালকোছাতে কাপড় পরি,
এক নিমিষে গাঁয়ের লোকে রূপার বাড়ি ফেলল ভরি।
লক্ষ্মে দাঁড়ায় ছমির লেঠেল, মমিনপুরের চর দখলে,
এক লাঠিতে একশ লোকের মাথা যে জন আসল দলে।
দাঁড়ায় গাঁয়ের ছমির বুড়ো, বয়স তাহার যদিও আশী,
গায়ে তাহার আজও আছে একশ লড়ার দাগের রাশি।
গর্জি উঠে গদাই ভুঁঞা, মোহন ভুঁঞার ভাজন^২ বেটা,
যার লাঠিতে মামুদপুরের নীল কুঠিতে লাগল লেঠা।
সব গাঁর লোক এক হল আজ রূপার ছোট উঠান পরে,
নাগ-নাগিনী আসল যেন সাপ খেলানো বাঁশীর স্বরে।
রূপা তখন বেড়িয়ে তাদের বলল, “শোন ভাই সকলে,
গাজনা চরের ধানের জমি আর আমাদের নাই দখলে।”
বহির মামু বলছে খবর—মোল্লারা সব কালকে নাকি;
আধেক জমির ধান কেটেছে, কালকে যারা কাঁচির^৩ খোঁচায়;
আজকে তাদের নাকের ডগা বাঁধতে হবে লাঠির আগায়।”
থামল রূপাই—ঠাটা যেমন মেঘের বুকো বাণ হানিয়া,
নাগ-নাগিনীর ফণায় যেমন তুবড়ী বাঁশীর সুর হাঁকিয়া।
গর্জে উঠে গাঁয়ের লোকে, লাটিম হেন ঘোড়ার লাঠি,
রোহিত মাছের মতন চলে, লাফিয়ে ফাটায় পায়ের মাটি।
রূপাই তাদের বেড়িয়ে বলে, “থাল বাজারে থাল বাজারে,
থাল বাজারে সড়কি ঘুরা হান্বে লাঠি এক হাজারে।
হান্বে লাঠি—হান্বে কুঠার, গাছের ছ্যান^৪ আর রাম-দা-ঘুরা,
হাতের মাথায় যা পাস যেথায় তাই লয়ে আজ আয়রে তোরা।”
“আলী! আলী! আলী!! আলী!!!” রূপার যেন কণ্ঠ ফাটি,
ইস্রাফিলের শিঙ্গা বাজে কাঁপছে আকাশ কাঁপছে মাটি।

তারি সুরে সব লেঠেলে লাঠির পরে হানল লাঠি,
“আলী-আলী” শব্দে তাদের আকাশ যেন ভাঙবে ফাটি।
আগে আগে ছুটল রূপা-বৌঁ বৌঁ বৌঁ সড়কি ঘোরে,
কাল সাপের ফণার মত বাবরী মাথায় চুল যে ওড়ে
চল্ল পাছে হাজার লেঠেল “আলী-আলী” শব্দ করি,
পায়ের ঘায়ে মাঠের ধুলো আকাশ বুঝি ফেলবে ভরি!
চল্ল তারা মাঠ পেরিয়ে চল্ল তারা বিল ডিঙিয়ে
কখন ছুটে কখন হেঁটে বুক বুক তাল ঠুকিয়ে।
চল্ল যেমন ঝড়ের দাপে ঘোলাট মেঘের দল ছুটে যায়,
বাও কুড়ানীর মতন তারা উড়িয়ে ধূলি পথ ভরি হয়!

দুপুর বেলা এল রূপাই গাজনা চরের মাঠের পরে,
সঙ্গে এল হাজার লেঠেল সড়কি লাঠি হস্তে ধরে!
লক্ষ্মে রূপা শূন্যে উঠি পড়ল কুঁদে মাটির পরে,
থাকল খানিক মাঠের মাটি দস্ত দিয়ে কামড়ে ধরে।
মাটির সাথে মুখ লাগায়, মাটির সাথে বুক লাগায়,
“আলী! আলী!!” শব্দ করি মাটি বুঝি দ্যায় ফাটায়।
হাজার লেঠেল হুকুরী কয়, “আলী আলী হজরত আলী,”
সুর শুনে তার বন-গেঁয়োদের কর্ণে বুঝি লাগল তালি!
তারাও সবে আসল জুটে দলে দলে ভীম পালোয়ান,
“আলী আলী” শব্দে যেন পড়ল ভেঙে সকল গাঁখান!
সামনে চেয়ে দেখল রূপা সার বেঁধে সব আসছে তারা,
ওপার মাঠের কোল ঘেঁষে কে বাঁকা তীরে দিচ্ছে নাড়া।
রূপার দলে এগোয় যখন, তারা তখন পিছিয়ে চলে,
তারা আবার এগিয়ে এলে এরাও হটে নানান কলে।

এমনি করে সাত আটবারে এগোন পিছন হল যখন,
রূপা বলে, “এমন করে ‘কাইজা’ করা হয় না কখন।”
তাল ঠুকিয়া ছুটল রূপাই, ছুটল পাছে হাজার লাঠি,
“আলী-আলী-হজরত আলী” কণ্ঠ তাদের যায় যে ফাটি।
তাল ঠুকিয়া পড়ল তারা বন-গেঁয়োদের দলের মাঝে,
লাঠির আগায় লাগল লাঠি, লাঠির আগায় সড়কি বাজে।

BANGLADARSHAN.COM

‘মার মার মার’ হাঁকল রূপা,—‘মার মার মার’ ঘুরায় লাঠি,
ঘুরায় যেন তারি সাথে পায়ের তলে মাঠের মাটি।
আজ যেন সে মৃত্যু-জনম ইহার অনেক উপরে উঠি,
জীবনের এক সত্য মহান লাঠির আগায় নিচ্ছে লুটে!
মরণ যেন মুখোমুখি নাচছে তাহার নাচার তালে,
মহাকালের বাজছে বিষণ আজকে ধরার প্রলয় কালে।
নাচে রূপা—নাচে রূপা—লোহুর গাঙে সিনান করি,
মরণেরে সে ফেলছে ছুঁড়ে রক্তমাখা হস্তে ধরি।
নাচে রূপা—নাচে রূপা—মুখে তাহার অটুহাসি,
বক্ষে তাহার রক্ত নাচে, চক্ষে নাচে অগ্নিরাশি।
—হাড়ে হাড়ে নাচন তাহার, রোমে রোমে লাগছে নাচন
কি যেন সে দেখেছে আজ, রুধ্তে নারে তারি মাতন।
বন-গেঁয়োরা পালিয়ে গেল, রূপার লোকও ফিরল বহু,
রূপা তবু নাচছে, গায়ে তাজা-খুনের হাসছে লোহু।

১) পো= ছেলে।

২) আলী= হজরত আলী; হজরত মুহম্মদের (দঃ) জামাতা। তিনি মহাবীর ছিলেন। এদেশে মারামারির সময় সকলে মিলিয়া “আলী আলী” শব্দ করে। কারও কারও মতে “আলী” “আল্লা” শব্দের অপভ্রংশ।

৩) ঠাটা= অশনি।

৪) ভাজন= ঔরসজাত।

৫) কাঁচির= কাস্তুর।

৬) গাছের ছ্যান= খেজুর গাছের ডগা কাটবার অস্ত্র।

বার

রাইত তুই যারে যা পোহাইয়ে।
বেলা গেল সন্ধ্যা হইল—ও হৈলরে! গৃহে জ্বালাও বাতি,
না জানি অবলার বন্ধু আসবেন কত রাতিরে!
রাইত তুই যারে—যা পোহাইয়ে।
রাইত না এক পরের হৈল, ও হৈলরে! তারায় জ্বলে বাতি;
রাঙ্কিয়া বাড়িয়া অন্ন জাগ্ব কত রাতিরে;
রাইত তুই যারে—যা পোহাইয়ে।
রাইত না দুই পরের হৈল ও হৈল রে, ডালে ডাকে গুয়া,
অঞ্চল বিছায়া নারী কাটে চেকন গুয়ারে।
রাইত তুই যারে—যা পোহাইয়ে।
রাইত না পরভাত হৈল—ও হৈলরে, কোকিল করে কুয়া,
খুইলে দাও মন্দিরার কেওয়াড় লাগুক শীতল হাওয়ারে।
রাইত তুই যারে—যা পোহাইয়ে।

—রাখালী গান

রূপাই গিয়াছে ‘কাইজা’ করিতে সেই ত সকাল বেলা,
বউ সারাদিন পথ পানে চেয়ে, দেখেছে লোকের মেলা।
কত লোক আসে কত লোক যায়, সে কেন আসে না আজ,
তবে কি তাহার নসিব মন্দ, মাথায় ভাঙিবে বাজ!
বালাই, বালাই, ওই যে ওখানে কালো গাঁর পথ দিয়া,
আসিছে লোকটি, ওই কি রূপাই? নেচে ওঠে তার হিয়া।
এলে পরে তারে খুব বকে দিবে, মাথায় ছেঁয়ায়ে হাত,
কিরা করাইবে লড়ায়ের নামে হবে না সে আর মাথ।
আঁচলে চোখে বারবার মাজে, না রে সে ত ও নয়,
আজকে তাহার কপালে কি আছে, কে তাহা ভাঙিয়া কয়।
লোহুর সাগরে সাঁতার কাটিয়া দিবস শেষের বেলা,
রাত্র-রাণীর কালো আঁচলেতে মুছিল দিনের খেলা।
পথে যে আঁধার পড়িল সাজুর মনে তার শতগুণ,
রাত এসে তার ব্যথার ঘায়েতে ছিটাইল যেন নুন!
ঘরের মেঝেতে সপটি ফেলায়ে বিছায়ে নক্সী-কাঁথা,
সেলাই করিতে বসিল যে সাজু একটু নোয়ায়ে মাথা।
পাতায় পাতায়, খস্ খস্ খস্ শুনে কান খাড়া করে,

যারে চায় সে ত আসেনাক শুধু ভুল করে করে মরে।
তবু যদি পাতা খানিক না নড়ে, ভাল লাগেনাক তার;
আলো হাতে লয়ে দূর পানে চায়, বার বার খুলে দ্বার।
কেন আসে নারে! সাজুর যদি গো পাখা দিত আজ বিধি,
উড়িয়া যাইয়া দেখিয়া আসিত তাহার সোনার নিধি।
নক্সী-কাঁথায় আঁকিল যে সাজু অনেক নক্সী-ফুল,
প্রথমে যেদিন রূপারে সে দেখে, সে খুশীর সমতুল।
আঁকিল তাদের বিয়ের বাসর, আঁকিল রূপার বাড়ি,
এমন সময় বাহিরে কে দেখে আসিতেছে তাড়াতাড়ি।

দুয়ার খুলিয়া দেখিল সে চেয়ে—রূপাই আসিছে বটে,
“এতক্ষণে এলে? ভেবে ভেবে যোগো প্রাণ নাই মোর ঘটে।
আর যাইও না কাইজা করিতে, তুমি যাহাদের মারো,
তাদের ঘরে ত আছে কাঁচা বউ, ছেলেমেয়ে আছে কারো।”

রূপাই কহিল কাঁদিয়া, “বউগো ফুরায়েছে মোর সব,
রাতে ঘুম যেতে শুনিবে না আর রূপার বাঁশীর রব।
লড়ায়ে আজিকে কত মাথা আমি ভাঙিয়াছি দুই হাতে,
আগে বুঝি নাই তোমারো মাথার সিঁদুর ভেঙেছে তাতে।
লোহু লয়ে আজ সিনান করেছি, রক্তে ভেসেছে নদী,
বুকের মালা যে ভেসে যাবে তাতে আগে জানিতাম যদি।
আঁচলের সোনা খসে যাবে পথে আগে যদি জানিতাম,
হায় হায় সখি, নারিনু বলিতে কি যে তবে করিতাম!”

বউ কেঁদে কয়, “কি হয়েছে বল, লাগিয়াছে বুঝি কোথা,
দেখি! দেখি!! দেখি!!! কোথায় আঘাত, খুব বুঝি তার ব্যথা!”
“লাগিয়াছে বউ, খুব লাগিয়াছে, নহে নহে মোর গায়,
তোমার শাড়ীর আঁচল ছিঁড়েছে, কাঁকন ভেঙেছে হায়!
তোমার পায়ের ভাঙিয়াছে খাডু ছিঁড়েছে গলার হার,
তোমার আমার এই শেষ দেখা, বাঁশী বাজিবে না আর।
আজ ‘কাইজার’ অপর পক্ষে খুন হইয়াছে বহু।
এই দেখ মোর কাপড়ে এখনো লাগিয়া রয়েছে লোহু।
থানার পুলিশ আসিছে হাঁকিয়া পিছে পিছে মোর ছুটি,

খোঁজ পেলে পরে এখনি আমার ধরে নিয়ে যাবে টুটি!
সাথীরা সকলে যে যাহার মত পালায়েছে যথা-তথা,
আমি আসিলাম তোমার সঙ্গে সেরে নিতে সব কথা।
আমার জন্য ভাবিনাক আমি, কঠিন ঝড়িয়া-বায়,
যে গাছ পড়িল, তাহার লতার কি হইবে আজি হয়!
হায় বনফুল, যেই ডালে তুই দিয়েছিলি পাতি বুক,
সে ডালেরি সাথে ভাঙিয়া পড়িল তোর সে সকল সুখ।
ঘরে যদি মোর মা থাকিত আজ তোমারে সঙ্গে করি,
বিনিদ্র রাত কাঁদিয়া কাটাত মোর কথা স্মরি স্মরি!
ভাই থাকিলেও ভাই-এর বউরে রাখিত যতন করি,
তোমার ব্যথার আধেকটা তার আপনার বুকে ভরি।
আমি যে যাইব ভাবিনাক, সাথে যাইবে কপাল-লেখা,
এ যে বড় ব্যথা! তোমারো কপালে ঐকে গেনু তারি রেখা।”
সাজু কেঁদে কয়, “সোনার পতিরে তুমি যে যাইবে ছাড়ি,
হয়ত তাহাতে মোর বুকখানা যাইতে চাহিবে ফাড়ি।
সে দুখেই আমি ঢাকিয়া রাখিব বুকের আঁচল দিয়া,
এ পোড়া রূপেরে কি দিয়ে ঢাকিব-ভেবে মরে মোর হিয়া।
তুমি চলে গেলে পাড়ার লোকে যে চাহিবে ইহার পানে,
তোমার গলার মালাখানি আমি লুকাইব কোন্ খানে!”

রূপা কয়, “সখি দীন দুঃখীর যারে ছাড়া কেহ নাই,
সেই আল্লার হাতে আজি আমি তোমারে সঁপিয়া যাই।
মাকড়ের আঁশে হস্তী যে বাঁধে, পাথর ভাসায় জলে,
তোমারে আজিকে সঁপিয়া গেলাম তাঁহার চরণ তলে।”
এমন সময়ে ঘরের খোপেতে মোরগ উঠিল ডাকি,
রূপা কয়, “সখি! যাই-যাই আমি-রাত বুঝি নাই বাকি!”
পায়ে পায়ে পায়ে কতদূর যায়; সাজু কয়, “ওগো শোন,
আর কিগো নাই মোর কাছে তব বলিবার কথা কোন?
দীঘল রজনী-দীঘল বরষ-দীঘল ব্যথার ভার,
আজ শেষ দিনে আর কোন কথা নাই তব বলিবার?”
রূপা ফিরে কয়, “না কাঁদিয়া সখি, পারিলামনাক আর,

ক্ষমা কর মোর চোখের জলের নিশাল^১ দেয়ার ধার।”
“এই শেষ কথা!” সাজু কহে কেঁদে, “বলিবে না আর কিছু?”
খানিক চলিয়া থামিল রূপাই, কহিল চাহিয়া পিছু,
“মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি, যদি কোন ব্যথা লাগে,
দুটি কালো চোখ সাজাইয়া নিও কাল কাজলের রাগে।
সিন্দুরখানি পরিও ললাটে—মোরে যদি পড়ে মনে,
রাঙা শাড়ীখানি পরিয়া সজনি চাহিও আরশী-কোণে।
মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি, যতনে বাঁধিও চুল,
আলসে হেলিয়া খোঁপায় বাঁধিও মাঠের কলমী ফুল।
যদি একা রাতে ঘুম নাহি আসে—না শুনি আমার বাঁশী,
বাহুখানি তুমি এলাইও সখি মুখে মেখে রাঙা হাসি।
চেয়ো মাঠ পানে—গলায় গলায় দুলিবে নতুন ধান;
কান পেতে থেকো, যদি শোন কভু সেথায় আমার গান।
আর যদি সখি, মোরে ভালবাস মোর তরে লাগে মায়া,
মোর তরে কেঁদে ক্ষয় করিও না অমন সোনার কায়া!”
ঘরের খোঁপেতে মোরগ ডাকিল, কোকিল ডাকিল ডালে,
দিনের তরণী পূর্ব সাগরে দুলে উঠে রাঙা পালে।
রূপা কহে, “তবে যাই যাই সখি, যেটুকু আঁধার বাকি,
তারি মাঝে আমি গহন বনেতে নিজেই ফেলিব ঢাকি!”
পায়ে পায়ে পায় কতদূর যায়, তবু ফিরে ফিরে চায়,
সাজুর ঘরেতে দীপ নিবু নিবু ভোরের উতলা বায়।

১) নিশাল= অবিরাম।

তেরো

বিদ্যাশেতে রইলা মোর বন্ধুরে।
বিধি যদি দিত পাখা,
উইড়া যায় দিতাম দেখা;
আমি উইড়া পড়তাম সোনা বন্ধুর দেশেরে।
আমরা ত অবলা নারী,
তরুতলে বাসা বান্ধিরে;
আমার বদন চুয়ায়া পড়ে ঘামরে।
বন্ধুর বাড়ী গঙ্গার পার
গেলে না আসিব আর;
আমার না-জান বন্ধু, না জানে সঁতাররে।
বন্ধু যদি আমার হও
উইড়া আইসা দেখা দাও
তুমি দাও দেখা জুড়াক পরাণরে।

—রাখালী গান

একটি বছর হইয়াছে সেই রূপাই গিয়াছে চলি,
দিনে দিনে দিন নব আশা লয়ে সাজুরে গিয়াছে ছলি।
কাইজায় যারা গিয়াছিল গাঁর, তারা ফিরিয়াছে বাড়ি,
শহরের জজ, মামলা হইতে সবারে দিয়াছে ছাড়ি।
স্বামীর বাড়িতে একা মেয়ে সাজু কি করে থাকিতে পারে,
তাহার মায়ের নিকটে সকলে আনিয়া রাখিল তারে।
একটি বছর কেটেছে সাজুর একটি যুগের মত,
প্রতিদিন আসি, বুকখানি তার করিয়াছে শুধু ক্ষত।
ও-গাঁয়ে রূপার ভাঙা ঘরখানি মেঘ ও বাতাসে হয়,
খুঁটি ভেঙে আজ হামাগুড়ি দিয়ে পড়েছে পথের গায়।
প্রতি পলে পলে খসিয়া পড়িছে তাহার চালের ছানি,
তারও চেয়ে আজি জীর্ণ শীর্ণ সাজুর হৃদয়খানি।
দুখের রজনী যদিও বা কাটে—আসে যে দুখের দিন,
রাত দিন দুটি ভাই বোন যেন দুখেরই বাজায় বীণ।
কৃষ্ণাণীর মেয়ে, এতটুকু বুক, এতটুকু তার প্রাণ,
কি করিয়া সহে দুনিয়া জুড়িয়া অসহ দুখের দান!

কেন বিধি তারে এত দুখ দিল, কেন, কেন, হয় কেন,
মনের-মতন কাঁদায় তাহারে ‘পথের কাঙালী’ হেন?

সোঁতের শেহলা ভাসে সোঁতে সোঁতে, সোঁতে সোঁতে ভাসে পানা,
দুখের সাগরে ভাসিছে তেমনি সাজুর হৃদয়খানা।
কোন্ জালুয়ার^১ মাছ সে খেয়েছে নাহি দিয়ে তার কড়ি,
তারি অভিশাপ ফিরিছে কি তার সকল পরাণ ভরি!
কাহার গাছের জালি কুমড়া সে ছিঁড়েছিল নিজ হাতে,
তাহারই ছোঁয়া কি লাগিয়াছে আজ তার জীবনের পাতে!
তোর দেশে বুঝি দয়া মায়া নাই, হা-রে নিদারুণ বিধি
কোন্ প্রাণে তুই কেড়ে নিয়ে গেলি তার আঁচলের নিধি।
নয়ন হইতে উড়ে গেছে হয় তার নয়নের তোতা,
যে ব্যথারে সাজু বহিতে পারে না, আজ তা রাখিবে কোথা?
এমনি করিয়া কাঁদিয়া সাজুর সারাটি দিবস কাটে,
আনমনে কভু একা চেয়ে রয় দীঘল গাঁয়ের বাটে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকাল যে কাটে—দুপুর কাটিয়া যায়,
সন্ধ্যার কোলে দীপ নিবু-নিবু সোনালী মেঘের নায়।
তবু ত আসে না। বুকখানি সাজু নখে নখে আজ ধরে,
পারে যদি তবে ছিঁড়িয়া ফেলায় সন্ধ্যার কাল গোরে।

মেয়ের এমন দশা দেখে মার সুখ নাই কোন মনে,
রূপারে তোমরা দেখেছো কি কেউ, শুধায় সে জনে জনে।
গাঁয়ের সবাই অন্ধ হয়েছে, এত লোক হাটে যায়,
কোন দিন কিগো রূপাই তাদের চক্ষে পড়েনি হয়!
খুব ভাল করে খোঁজে যেন তারে, বুড়ী ভাবে মনে মনে,
রূপাই কোথাও পালাইয়া আছে হয়ত হাটের কোণে।
ভাদ্র মাসেতে পাটের বেপারে কেউ কেউ যায় গাঁয়,
নানা দেশে তারা নাও বেয়ে যায় পদ্মানদীর পার।
জনে জনে বুড়ী বলে দেয়, “দেখ, যখন যেখানে যাও,
রূপার তোমরা তালাস লইও, খোদার কছম খাও।”
বর্ষার শেষে আনন্দে তারা ফিরে আসে নায়ে নায়ে,
বুড়ী ডেকে কয়, “রূপারে তোমরা দেখ নাই কোন গাঁয়ে!”

বুড়ীর কথার উত্তর দিতে তারা নাহি পায় ভাষা,
কি করিয়া কহে, আর আসিবে না যে পাখি ছেড়েছে বাসা।

চৈত্র মাসেতে পশ্চিম হতে জন খাটিবার তরে,
মাথাল মাথায় বিদেশী চাষীরা সারা গাঁও ফেলে ভরে।
সাজুর মায়ে যে ডাকিয়া তাদের বসায় বাড়ির কাছে,
তামাক খাইতে হুকো এনে দ্যায়, জিজ্ঞাসা করে পাছে;
“তোমরা কি কেউ রূপাই বলিয়া দেখেছ কোথাও করে,
নিটল তাহার গঠন গাঠন, কথা কয় ভাবে ভাবে।”
এমনি করিয়া বলে বুড়ী কথা, তাহারা চাহিয়া রয়,—
রূপারে যে তারা দেখে নাই কোথা, কেমন করিয়া কয়!
যে গাছ ভেঙেছে ঝড়িয়া বাতাসে কেমন করিয়া হয়,
তারি ডালগুলো ভেঙে যাবে তারা কঠোর কুঠার-ঘায়?

কেউ কেউ বলে, “তাহারি মতন দেখেছিঁনু একজনে,
আমাদের সেই ছোট গাঁর পথে চলে যেতে আনমনে।”
“আচ্ছা, তাহারে শুধাও কি কেহ, কখন আসিবে বাড়ি,
পরদেশে সে যে কোন্ প্রাণে রয় আমার সাজুরে ছাড়ি?”

গাঙে-পড়া-লোক যেমন করিয়া তৃণটি আঁকড়ি ধরে,
তেমনি করিয়া চেয়ে রয় বুড়ী তাদের মুখের পরে।
মিথ্যা করেই তারা বলে, “সে যে আসিবে ভাদ্র মাসে,
খবর দিয়েছে, বুড়ী যেন আর কাঁদে না তাহার আশে।”

এত যে বেদনা তবু তারি মাঝে একটু আশার কথা,
মুহূর্তে যেন মুছাইয়া দেয় কত বরষের ব্যথা।

মেয়েরে ডাকিয়া বার বার কহে “ভাবিস না মাগো আর,
বিদেশী চাষীরা কয়ে গেল মোরে—খবর পেয়েছে তারা।”

মেয়ে শুধু দুটি ভাষা-ভরা আঁখি ফিরাল মায়ের পানে;
কত ব্যথা তার কমিল ইহাতে সেই তাহা আজ জানে।

গণিতে গণিতে শ্রাবণ কাটিল, আসিল ভাদ্র মাস,
বিরহী নারীর নয়নের জলে ভিজিল বুকের বাস।

আজকে আসিবে কালকে আসিবে, হয় নিদারুণ আশা,
ভোরের পাখির মতন শুধুই ভোরে ছেড়ে যায় বাসা।

আজকে কতনা কথা লয়ে যেন বাজিছে বুকের বীণে,
সেই যে প্রথম দেখিল রূপারে বদনা-বিয়ের দিনে।
তারপর, সেই হাট ফেরা পথে তারে দেখিবার তরে,
ছল করে সাজু দাঁড়ায়ে থাকিত গাঁয়ের পথের পরে।
নানা ছুতো ধরি কত উপহার তারে সে যে দিত আনি,
সেই সব কথা আজ তার মনে করিতেছে কানাকানি।
সারা নদী ভরি জাল ফেলে জেলে যেমনি করিয়া টানে,
কখন উঠায়, কখন নামায়, যত লয় তার প্রাণে;
তেমনি সে তার অতীতেরে আজি জালে জড়াইয়া টানে,
যদি কোন কথা আজিকার দিনে কয়ে যায় নব-মানে।

আর যেন তার কোন কাজ নাই, অতীত আঁধার গাঙে,
ডুবাবু মত ডুবিয়া ডুবিয়া মানিক মুকুতা মাঙে।
এতটুকু মান, এতটুকু স্নেহ এতটুকু হাসি খেলা,
তারি সাথে সাজু ভাসাইতে চায় কত না সুখের ভেলা!
হায় অভাগিনী! সে ত নাই জানে আগে যারা ছিল ফুল,
তারাই আজিকে ভজঙ্গ হয়ে দহিছে প্রাণের মূল।
যে বাঁশী শুনিয়া ঘুমাইত সাজু, আজি তার কথা স্মরি,
দহন নাগের গলা জড়াইয়া একা জাগে বিভাবরী।
মনে পড়ে আজ সেই শেষ দিনে রূপার বিদায় বাণী—
“মোর কথা যদি মনে পড়ে তবে পরিও সিঁদুরখানি।”
আরও মনে পড়ে, “দীন দুঃখীর যে ছাড়া ভরসা নাই,
সেই আল্লার চরণে আজিকে তোমারে সঁপিয়া যাই।”
হায় হায় পতি, তুমি ত জান না কি নিষ্ঠুর তার মন;
সাজুর বেদনা সকলেই শোনে, শোনে না সে একজন।
গাছের পাতারা ঝরে পড়ে পথে, পশুপাখি কাঁদে বনে,
পাড়া প্রতিবেশী নিতি নিতি এসে কেঁদে যায় তারি সনে।
হায়রে বধির, তোর কানে আজ যায় না সাজুর কথা;
কোথা গেলে সাজু জুড়াইবে এই এক বুক-ভরা ব্যথা।
হায় হায় পতি, তুমি ত ছাড়িয়া রয়েছ দূরের দেশে,
আমার জীবন কি করে কাটিবে কয়ে যাও কাছে এসে!

দেখে যাও তুমি দেখে যাও পতি তোমার লাউ-এর লতা,
পাতাগুলি তার উনিয়া পড়েছে লয়ে কি দারুণ ব্যথা।
হালের খেতেতে মন টিকিত না আধা কাজ ফেলে বাকি,
আমাকে দেখিতে বাড়ি যে আসিতে করি কতরূপ ফাঁকি।
সেই মোরে ছেড়ে কি করে কাটাও দীর্ঘ বরষ মাস,
বলিতে বলিতে ব্যথার দহনে থেমে আসে যেন শ্বাস।

নক্সী-কাঁথাটি বিছাইয়া সাজু সারারাত আঁকে ছবি,
ও যেন তাহার গোপন ব্যথার বিরহিয়া এক কবি।
অনেক সুখের দুঃখের স্মৃতি ওরি বুকে আছে লেখা,
তার জীবনের ইতিহাসখানি কহিছে রেখায় রেখা।
এই কাঁথা যবে আরম্ভ করে তখন সে একদিন,
কৃষ্ণাণীর ঘরে আদরিণী মেয়ে সারা গায়ে সুখ-চিন।
স্বামী বসে তার বাঁশী বাজায়েছে, সিলাই করেছে সে যে;
গুনগুন করে গান কভু রাঙা ঠোঁটেতে উঠেছে বেজে।

সেই কাঁথা আজো মেলিয়াছে সাজু যদিও সেদিন নাই,
সোনার স্বপন আজিকে তাহার পুড়িয়া হয়েছে ছাই।
খুব ধরে ধরে আঁকিল যে সাজু রূপার বিদায় ছবি,
খানিক যাইয়া ফিরে ফিরে আসা, আঁকিল সে তার সবি।
আঁকিল কাঁথায়-আলু থালু বেশে চাহিয়া কৃষ্ণাণ নারী,
দেখিছে-তাহার স্বামী তারে যায় জনমের মত ছাড়ি!
আঁকিতে আঁকিতে চোখে জল আসে, চাহনি যে যায় ধুয়ে,
বুকে কর হানি, কাঁথার উপরে পড়িল যে সাজু শুয়ে!
এমনি করিয়া বহুদিন যায়, মানুষে যত না সহে,
তার চেয়ে সাজু অসহ্য ব্যথা আপনার বুকে বহে!
তারপর শেষে এমনি হইল, বেদনার ঘায়ে ঘায়ে,
এমন সোনার তনুখানি তার ভাঙিল ঝড়িয়া-বায়ে।
কি যেন দারুণ রোগেতে ধরিল, উঠিতে পারে না আর;
শিয়রে বসিয়া দুঃখিনী জননী মুছিল নয়ন-ধার।
হায় অভাগীর একটি মানিক! খোদা, তুমি ফিরে চাও,
এরে যদি নিবে তার আগে তুমি মায়েরে লইয়া যাও!

BANGLADARSHAN.COM

ফিরে চাও তুমি আল্লা রসুল! রহমান তব নাম,
দুনিয়ার আর কহিবে না কেহ তারে যদি হও বাম!

মেয়ে কয়, “মাগো! তোমার বেদনা জানি আমি সব জানি
তার চেয়ে যোগো অসহ্য ব্যথা ভাঙে মোর বুকখানি!
সোনা মা আমার! চক্ষু মুছিয়া কথা শোন, খাও মাথা,
ঘরের মেঝে মেলে ধর দেখি আমার নক্সী-কাঁথা!
একটু আমারে ধর দেখি মাগো, সূঁচ সূতা দাও হাতে,
শেষ ছবিখানা ঐকে দেখি যদি কোন সুখ হয় তাতে।”
পাণ্ডুর হাতে সূঁচ লয়ে সাজু আঁকে খুব ধীরে ধীরে,
আঁকিয়া আঁকিয়া আঁখি জল মুছে দেখে কত ফিরে ফিরে।
কাঁথার উপরে আঁকিল যে সাজু তাহার কবরখানি,
তারি কাছে এক গৈয়ো রাখালের ছবিখানি দিল টানি;
রাত আন্ধার, কবরের পাশে বসি বিরহীর বেশে,
অঝোরে বাজায় বাঁশের বাঁশীটি, বুক যায় জলে ভেসে!

মনের মতন আঁকি এই ছবি দেখে বারবার করি,
দুটি পোড়া চোখ বারবার শুধু অশ্রুতে উঠে ভরি।
দেখিয়া দেখিয়া ক্লান্ত হইয়া কহিল মায়েরে ডাকি,
“সোনা মা আমার! সত্যিই যদি তোরে দিয়ে যাই ফাঁকি;
এই কাঁথাখানি বিছাইয়া দিও আমার কবর পরে,
ভোরের শিশির কাঁদিয়া কাঁদিয়া এরি বুক যাবে ঝরে!
সে যদি গো আর ফিরে আসে কভু, তার নয়নের জল,
জানি জানি মোর কবরের মাটি ভিজাইবে অবিরল।
হয়তো আমার কবরের ঘুম ভেঙে যাবে মাগো তাতে,
হয়ত তাহারে কাঁদাইতে আমি জাগিব অনেক রাতে।
এ ব্যথা সে মাগো কেমনে সহিবে, বোলো তারে ভালো করে,
তার আঁখি জল ফেলে যেন এই নক্সী-কাঁথার পরে।
মোর যত ব্যথা, মোর যত কাঁদা এরি বুক লিখে যাই,
আমি গেলে মোর কবরের গায় এরে মেলে দিও তাই!
মোর ব্যথা সাথে তার ব্যথাখানি দেখে যেন মিল করে,
জনমের মত সব কাঁদা আমি লিখে গেনু কাঁথা ভরে।”

BANGLADARSHAN.COM

বলিতে বলিতে আর যে পারে না, জড়াইয়া আসে কথা,
অচেতন হয়ে পড়িল যে সাজু লয়ে কি দারুণ ব্যথা!
কানের কাছেতে মুখ লয়ে মাতা ডাক ছাড়ি কেঁদে কয়,
“সাজু সাজু! তুই মোরে ছেড়ে যাবি এই তোর মনে লয়?”
“আল্লা রসুল! আল্লা রসুল!” বুড়ী বলে হাত তুলে,
“দীন দুঃখীর শেষ কান্না এ আজিকে যেয়ো না ভুলে!”
দুই হাতে বুড়ী জড়াইতে যায় আঁধার রাতের কালি,
উতলা বাতাস ধীরে বয়ে যায়, সব খালি! সব খালি!!
“সোনার সাজুরে, মুখ তুলে চাও, বলে যাও আজ মোরে,
তোমারে ছাড়িয়া কি করে যে দিন কাটিবে একেলা ঘরে।”
দুখিনী মায়ের কান্নায় আজি খোদার আরশ কাঁপে,
রাতের আঁধার জড়াজড়ি করে উতল হাওয়ার দাপে।

১) জালুয়া= জেলে।

BANGLADARSHAN.COM

চৌদ্দ

উইড়া যায়রে হংস পঞ্জি পইড়া রয়রে ছায়া;

দেশের মানুষ দেশে যাইব-কে করিবে মানা।

—মুর্শিদা গান

আজো এই গাঁও অঝোরে চাহিয়া ওই গাঁওটির পানে,
নীরবে বসিয়া কোন্ কথা যেন কহিতেছে কানে কানে।
মধ্যে অথই শুনো মাঠখানি ফাটলে ফাটলে ফাটি;
ফাগুনের রোদে শুখাইছে যেন কি ব্যথারে মুক মাটি!
নিঠুর চাষীরা বুক হতে তার ধানের বসনখানি,
কোন্ সে বিরল পল্লীর ঘরে নিয়ে গেছে হয় টানি!

বাতাসের পায়ে বাজে না আজিকে ঝল মল মল গান,
মাঠের ধুলায় পাক খেয়ে পড়ে কত যেন হয়ে ম্লান!
সোনার সীতারে হরেছে রাবণ, পল্লীর পথ পরে,
মুঠি মুঠি ধানে গহনা তাহার পড়িয়াছে বুঝি ঝরে!
মাঠে মাঠে কাঁদে কলমীর লতা, কাঁদে মটরের ফুল,
এই একা মাঠে কি করিয়া তারা রাখিবোগো জাতি-কুল।
লাঙল আজিকে হয়েছে পাগল, কঠিন মাটির চিরে,
বুকখানি তার নাড়িয়া নাড়িয়া ঢেলারে ভাঙিবে শিরে।

তবু এই গাঁও রহিয়াছে চেয়ে, ওই গাঁওটির পানে,
কত দিন তারা এমনি কাটানে কেবা তাহা আজ জানে।
মধ্যে লুটায় দিগন্ত-জোড়া নক্ষত্রী-কাঁথার মাঠ;
সারা বুক ভরি কি কথা সে লিখি, নীরবে করিছে পাঠ!
এমন নাম ত শুনিনি মাঠের? যদি লাগে কারো ধাঁধা,
যারে তারে তুমি শুধাইয়া নিও, নাই কোন এর বাধা।

সকলেই জানে, সেই কোন্ কালে রূপা বলে এক চাষী,
ওই গাঁওর এক মেয়ের প্রেমেতে গলায় পড়িল ফাঁসি।
বিয়েও তাদের হয়েছিল ভাই, কিন্তু কপাল-লেখা,
খণ্ডাবে কে? দারুণ দুঃখ ভালে ঐকে গেল রেখা।
রূপা এক দিন ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে গেল দূর দেশে,

তারি আশা-পথে চাহিয়া চাহিয়া বউটি মরিল শেষে
মরিবার কালে বলে গিয়েছিল-তাহার নক্সী-কাঁথা,
কবরের গায় মেলে দেয় যেন বিরহিণী তার মাতা!

বহুদিন পরে গাঁয়ের লোকেরা গভীর রাতের কালে,-
শুনিল কে যেন বাজাইছে বাঁশী বেদনার তালে তালে।
প্রভাতে সকলে দেখিল আসিয়া সেই কবরের গায়,
রোগ পাণ্ডুর একটি বিদেশী মরিয়া রয়েছে হায়!
শিয়রের কাছে পড়ে আছে তার কখানা রঙিন শাড়ী,
রাঙা মেঘ বেয়ে দিবসের রবি যেন চলে গেছে বাড়ি!
সারা গায় তার জড়ায়ে রয়েছে সেই সে নক্সী-কাঁথা,
আজও গাঁর লোকে বাঁশী বাজাইয়া গায় এ করুণ গাথা।

কেহ কেহ নাকি গভীর রাত্রে দেখেছে মাঠের পর,-
মহা-শূন্যেতে উড়াইছে কেবা নক্সী-কাঁথাটি ধরে;
হাতে তার সেই বাঁশের বাঁশীটি বাজায় করুণ সুরে,
তারি টেউ লাগি এ-গাঁও ওগাঁও গহন ব্যথায় বুঝে।
সেই হতে গাঁর নামটি হয়েছে নক্সী-কাঁথার মাঠ
ছেলে বুড়ো গাঁর সকলেই জানে ইহার করুণ পাঠ।

॥সমাপ্ত॥